# আচার্য সুনীতিকুমার

ডঃ পরমানন্দ হালদার
ও
এস কে নাগ
সম্পাদিত

নিউ বুক এণ্টারপ্রাইজ
১৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

# ACHARYA SUNITIKUMAR

by Dr. Paramananda Halder

and

S. K. Nag

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

প্রকাশক :

অদ্বৈত কুমার মণ্ডল

১৮এ, টেমার লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণে :

শ্রীবংশীধর সিংহ

বাণী মুদ্রন

১২, নরেন সেন স্কোয়ার

কলিকাতা-৭০০০০৯

## যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ ঃ

## সবিনয় নিবেদন

যুগে যুগে দেশে দেশে এমন এক একজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। আমাদের দেশে এমনই একজন মনীষী হলেন আচার্য সুনীতিকুমার। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতি এবং রচিত গ্রন্থরাজির প্রভাব ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর জীবনে চিরদিন অপরিম্লান থাকবে।

মহাজীবনের কাহিনী মানুষের চরিত্রগঠনে সাহায্য করে। এক যুগ থেকে অন্য যুগে স্বর্গের অমৃত প্রবাহের মতো মনীষীদের দেবোপম আদর্শ চরিত্র মহিমা মানুষকে দিব্য জীবনের সোনার কাঠির স্পর্শে সঞ্জীবিত করে তোলে। তাই যে কোন মহাপুরুষের জীবন-চরিত যে কোন জাতির অক্ষয় সম্পদের ভাণ্ডার।

আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর কর্মময় জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে বহু পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সারগর্ভ প্রবন্ধ দেখে আমাদের মনে হয়েছিল, এগুলিকে গ্রন্থাকারে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কারণ পত্র-পত্রিকা সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই গ্রন্থের মাধ্যমে সেগুলিকে সঞ্চিত করে রাখলে দেশ ও জাতি দুই-ই উপকৃত হবে। আমাদের মনের বাসনা পরিপূর্ণতা লাভ করল বইটির প্রকাশন সংস্থায় হাজির হ'য়ে। সানন্দে রাজি হলেন শ্রীযুত্ অদ্বৈতকুমার মণ্ডল, যিনি ব্যক্তিগতভাবে আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

আমাদের দেশে বিজাতীয় এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানেও পরিবেশিত হচ্ছে বলে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও নীতিহীনতা প্রবল হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষকে মহত্তর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাই আজ এই ধরণের জীবনী-গ্রন্থরাজির বহুল প্রচার দরকার।

উপনিষদ্‌কার বলেছেন—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য, বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

মানুষ যদি বরণীয়কে বরণ করবার জন্য, মহৎ আদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা করে নিতে চায়, তাহলে তাকে নিরলস কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তার এই কাজে মহাপুরুষদের জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা, ত্যাগ ও

ভোগ, শৌর্য ও ক্ষমা প্রভৃতি প্রেরণার সৃষ্টি করবে। বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। অর্থাৎ মহাজনদের সৃষ্ট পথই সাধারণের অনুসরণীয়। অতএব ভাষাতাত্ত্বিক প্রদর্শিত পথ যদি আমাদের সংকলিত গুণীজন সম্বন্ধ সারগর্ভ প্রবন্ধ থেকে কেউ পান, তা'হলে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থকতা লাভ করবে।

পরিশেষে ব'লব আচার্যদেবের চরিত্র উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্যমান। ঐ বহ্নিশিখা কখনই নির্বাপিত হবে না। শুধু মনুষ্য হৃদয় থেকে মনুষ্য হৃদয়ে, যুগ থেকে যুগে, দেশ থেকে দেশের মানুষকে প্রবুদ্ধ করবে।

এবার কৃতজ্ঞতা জানাবার পালা। গ্রন্থখানি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা থেকে, স্বনামধন্য লেখকদের কাছ থেকে লেখা নিয়েছি তাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বন্ধুবর লেখক ও শিক্ষক শ্রীযুত্ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়কে, যিনি তাঁর অমূল্য সময় অপচয় করে আমাদের পাশে থেকে প্রকাশ ত্বরান্বিত করেছেন।

আচার্যদেবের পুত্রবধূ শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায় সুনীতিবাবুর ছাত্রাবস্থায় থাকা লণ্ডনের একটি ছায়াচিত্র আমাদের গ্রন্থে ছাপবার সুযোগ দিয়েছেন ব'লে আমরা তাঁর কাছেও চিরকৃতজ্ঞ।

আমাদের পরিবেশিত গ্রন্থটির কোথাও যদি কোন ভুলত্রুটী হৃদয়বান পাঠক-পাঠিকার চোখে ধরা পড়ে, তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় জানালে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সহৃদয়তার সঙ্গে সংশোধিত হবে।

অলম্ অতি বিস্তারেণ

বিনীত

সম্পাদকদ্বয়

# ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের জন্ম কুণ্ডলী

## (ভৃগুজাতক)

জন্ম ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৬/৫ মিঃ ; জন্মস্থান ঃ কলিকাতা। ২৬শে নভেম্বর ১৮৯০ খ্রীঃ, বুধবার। তিরোধান ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৩৮৪।৪।২০ মিঃ-১৯৭৭ খ্রীঃ ২৯শে মে।

বৃষলগ্ন, রোহিণী নক্ষত্র, বৃষরাশি, নরগণ—শূদ্রবর্ণ।

'কথা-সাহিত্য' পত্রিকা ও শ্রদ্ধেয় ভানুবাবুর সৌজন্যে।
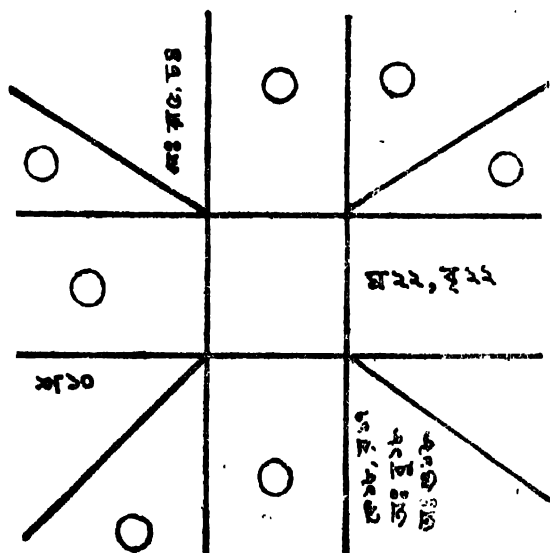
যুবক সুনীতি কুমার

ছবি :—ছায়া চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

## শিল্পকলা

আকাঙ্ক্ষা না হইলে পূর্তি হয় না। দেশের লোকের মধ্যে চাহিদা না থাকিলে, শিল্প অথবা অন্য কোনও বস্তুরই প্রসার বা উন্নতির সম্ভাবনা হয় না। ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে, শিল্পের সমঝদার এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, উভয়েরই অভাব। শিল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সমর্থ, অধিকাংশ স্থলে তাঁহার রুচি বিকৃত, এবং স্বদেশী শিল্পী ও শিল্প-দ্রব্য দুই-ই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প-শিক্ষারও অভাব এবং দেশ নিতান্ত দরিদ্র।...

বাঙালীর শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে, বাঙালীর জীবনের মধ্যে নিহিত সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, আদর্শবাদ ও বাস্তবিকতা—এই সমস্তকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।......

বাঙালীর জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যদি কিছু বড়ো জিনিস থাকে—এমন জিনিস যাহা সত্য-সত্যই সমগ্র জাতির দেহ মন ও প্রাণকে নাড়া দেয়, তবে সর্বদর্শী এবং কৃতী শিল্পী থাকিলে তাহার উপযুক্ত শিল্পময় প্রকাশ হইবেই।...

— শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'তাঁহার কোন গোঁড়ামি নাই। তিনি ন্যাকামি সহ্য করিতে পারেন না। 'আদিখ্যেতা' কথাটা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনি, এটা তাঁহার বরদাস্তের অতীত। কিন্তু তাই বলিয়া কোন নিষ্ঠাবানের আচরণে তাঁহাকে কটাক্ষ করিতে শুনি নাই। পরমত সহিষ্ণুতা তাঁহার একটি প্রধান গুণ। নিজ আচরণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, নিজ মতবাদে অবিচল থাকিয়াও, ভিন্ন আচারী, বিভিন্ন মতাবলম্বী পাঁচজনকে লইয়া তিনি ঘর করিতে জানেন। নিজের জন্য অপরকে ব্যতিব্যস্ত বা আপনার ক্রিয়াকলাপে একটা দৃশ্য সৃষ্টি করা, এটাও তাঁহার ধাতুতে নাই।'

**— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়**

সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্য তাঁর গায়ের জামা-জোড়া নয়। সে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল। এ পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রমধ্যে যিনি এসেছেন তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন কেমন সহজে তাঁর পাণ্ডিত্যের রশ্মি বিকীর্ণ হয়। বস্তুত, সুনীতিবাবু যেন একটি ব্যক্তি নন, একটি ইনস্টিটিউশন, একটি আসর। সে শুধু বিদ্যার ও জ্ঞানের রঙ্গভূমি নয়, সেখানে নানা দেশের নানা অভিজ্ঞতায় ও জ্ঞাতব্যের পরিচিত অপরিচিত অনেক কিছুরই পরিচয় পাই। জীবনকে তলিয়ে না দেখেও এমন সহজভাবে ভালবাসা আমি আর বড় কোথাও দেখিনি।'

**— সুকুমার সেন**

'শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বহুবার বহু বইতে একটা কথা পড়িয়াছি, তাহা হইল এই যে, এক বিষয়ে বিশেষ করিয়া জানা আর সঙ্গে সঙ্গে

সব বিষয়েই কিছু কিছু করিয়া জানা—ইহাই হইল আদর্শ শিক্ষা। এইভাবে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আমরা কম আসিয়াছি ; যে কয়েকজনের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে আচার্য সুনীতিকুমারকে তাহার মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য করি। তাঁহার নিজের বিশেষ বিষয় ভাষাতত্ত্বে তাঁহার কি অধিকার আছে এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজে কাহারও কোন সংশয় নাই ; কিন্তু সেই সঙ্গে বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার আশপাশের অন্য সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি যে কোন বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ, অনুশীলন এবং অধিকার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। …আচার্য সুনীতিকুমার তাঁহার জীবনে যত দেশবিদেশ ঘুরিয়াছেন বাঙালীদের মধ্যে তাহা একান্ত বিরল না হইলেও সংখ্যায় অতি অল্প। এত দেশ ভ্রমণ এবং সর্বদেশের মণীষী এবং মোটামুটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় সুনীতিকুমারের মানসিক পরিমণ্ডলকে বিরাট বিস্তৃতি দান করিয়াছে। মানুষকে সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিতে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি তিনি লাভ করিয়াছেন,—আবার তাহার মধ্যেই তিনি রক্ষা করিয়াছেন প্রবল জাত্যাভিমানকে। সে জাত্যাভিমানে তিনি শুধু একজন ভারতীয় হিন্দু নন, তিনি বিশেষভাবেই একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ ; সেই বাঙালী ব্রাহ্মণের প্রতীক চিহ্ন চাদরখানিকে আজ পর্যন্ত সেই জাতীয় গর্বেই বহন করিয়া বেড়ান। কিন্তু একটি মানুষকে দেহে-মনে খাঁটি বাঙালী ব্রাহ্মণ হইয়াও আবার নিখিল মানুষের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে বিশ্বনাগরিক হইয়া উঠিতে যে কোথাও কোনো বাধা নাই এইটাই সুনীতিকুমারের প্রতিপাদ্য। জাতীয়তা এবং বিশ্বনাগরিকতাকে যে সর্বদা পরস্পরবিরোধীই করিয়া তুলিতে হইবে এমন কথা নাই ; উভয়ের মধ্যে যে একটি স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের সম্ভাবনা রহিয়াছে এই সত্যের প্রতিই তাঁহার ইঙ্গিত।’

— **শশিভূষণ দাশগুপ্ত**

'…শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার জীবনে পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, বুদ্ধির বলে শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রণাম, তত্ত্ব,, তথ্য, অনেকই পেয়েছেন, তার উপরেও একটি আশ্চর্য-প্রাপ্তি তাঁর হয়েছে, সেটি এই জগৎ ও জীবনের মধ্যে সকলতত্ত্ব ও তথ্যের বাইরে যা উর্ধ্বলোকে একটি আনন্দময়তার পরিবেশ আছে • সেই পরিবেশের বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছেন—তার আলো থেকে তিনি একটি প্রসন্ন প্রশান্ত দৃষ্টি পেয়েছেন, যাতে তিনি অবগাহন করে তার পুণ্য ফল · বাঙালী জীবনকে দিয়ে গেলেন।

— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'পাণ্ডিত্য ছাড়াও সুনীতিকুমার বিবিধ সামাজিক গুণের অধিকারী। যেমন বড় সভায় তেমনি ছোট অন্তরঙ্গ আসরেও তিনি তাঁহার সংলাপচাতুর্য ও সামাজিক সহৃদয়তার পরিচয় দেন। অতি জটিল তত্ত্বকেও সহজবোধ্য করিয়া উপস্থাপিত করায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য। তাঁহার বিপুল পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী জ্ঞানসম্ভার তাঁহার মনের সহজ স্বচ্ছন্দতা ও লঘু চালকে বিন্দুমাত্র নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার রসিক, মজলিসী মন তাঁহার জ্ঞানপ্রকাশকে দীপ্ত ও উপভোগ্য করে। তিনি শুধু জ্ঞানী নহেন, জ্ঞানের রুচিকর পরিবেশনেও সিদ্ধহস্ত।

— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য সুনীতিকুমার সাতাশি বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সাতাশি বছরকে স্বল্পায়ু বলা চলে না—তবু এ ক্ষেত্রে মৃত্যু অপ্রত্যাশিত। কারণ সুনীতিকুমারের অটুট স্বাস্থ্য প্রবীণগণের ঈর্ষার ও নবীনগণের বিস্ময়ের বিষয় ছিল। এই বয়সেও তাঁর চলন, বলন উত্তম ও কর্মক্ষমতায় ভাঁটার টান দেখা দেয়নি, সকলেরই আশা ছিল তিনি পরমায়ুর দশক পূর্ণ করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মৃত্যু

সম্বন্ধে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিরর্থক। তাঁর লোকান্তর প্রয়াণ আকস্মিকের বজ্রপাতের মতো সমস্ত বাঙালী সমাজকে অভিভূত করে ফেলেছে, আর শুধু বাঙালী সমাজই বা বলি কেন, ভারতীয় বিদ্বদ্‌সমাজকেও এই দুর্ঘটনার তরঙ্গ আঘাত করবে, এমন কি এই তরঙ্গের শেষ প্রান্ত পৃথিবীর বিদ্বদ্‌সমাজেও গিয়ে আঘাত করবে। এই বাঙালী মনীষী শেষ জীবনে বিশ্বমনীষীতে পরিণত হয়েছিলেন।

সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্যের সূত্রপাত বাংলাভাষাতত্ত্ব থেকে, কিন্তু কালক্রমে তা জ্ঞানের বহুবিধ শাখাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিল—শেষ পর্যন্ত অল্প বিষয়ই তাঁর অনায়ত্ত ছিল। এইরকম বহু শাখাসম্পন্ন জ্ঞানকে ইংরাজি ভাষায় এনসাইক্লোপিডিক বলা হয়ে থাকে। বাংলাভাষায় কি বলবো জানি না, জ্ঞানের বিশ্বরূপদর্শন বললে বোধকরি অন্যায় হয় না। তাঁর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করেছেন, আরও অনেকে করবেন, আর এ বিষয়টি চিরকালের আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকবে। আমি এ বিষয়ে আলোচনার অনধিকারী, জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার সঞ্চয় আমাতে এত অল্প যে, তাঁর জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ দূরে থাক সামান্য একটি সূচীপত্র রচনাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই সে দুরাশা পরিত্যাগ করে সুনীতিকুমারের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের অন্য কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

সুনীতিকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা বলবো। ঐ একটিমাত্র কথার মধ্যেই সমস্ত কথা আছে অর্থাৎ তার বেশি আর বলা সম্ভব নয়। আমি কখনো তাঁকে এমন কাজ করতে বা এমন বাক্য উচ্চারণ করতে দেখিনি যাতে অপরের অপকার হয়। সম্ভব হলে লোকের সাহায্য বা উপকার করেছেন, তবে অপকার কখনো নয়। অপকার করতে দেখিনি বললে যথেষ্ট বলা হল না, বোধকরি, তাঁর দ্বারা অপরের অপকার হয়েছে এমন কখনো শুনিনি। এমন কথা ক'জন লোক সম্বন্ধে বলা যায় সকলকে ভেবে দেখতে অনুরোধ

করি। তাঁর সঙ্গে আমার সুদীর্ঘকালের পরিচয়, পঞ্চাশ বছরের বেশি। প্রথমে যে পরিচয় চাক্ষুষ মাত্র ছিল কালক্রমে তা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কাজেই আমার এই উক্তির মূল্য সামান্য নয়। এমন কি করে সম্ভব হয় অনেক সময় চিন্তা করেছি, পরে মনে হয়েছে এর মূলে আছে আত্মপ্রসন্নতা। যে ব্যক্তির মন সদাপ্রসন্ন তার পক্ষে অপরে অপ্রসন্ন হতে পারে এমন কিছু করা সম্ভব নয়। এই আত্মপ্রসন্নতা প্রতিফলিত ছিল তাঁর মুখে চোখে হাসিতে।

এবারে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক বস্তু নয়। আমাদের দেশে দেখতে পাই মানুষের ব্যক্তিত্ব একপেশে বা এক বগ্‌গা হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি পণ্ডিত সে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, পাণ্ডিত্য ছাড়া আর তার কোন মূলধন নেই। যে ব্যক্তি ধার্মিক, অষ্টপ্রহর ধর্মের কথা বলে সে। এমনধারা শিক্ষক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হতে পারে। বেশ চৌকষভাবে বেড়ে উঠেছে এমন ব্যক্তিত্ব বড় দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যদেশ সম্বন্ধে বই পড়ে যে জ্ঞান হয়েছে তাতে দেখেছি তাদের ব্যক্তিত্ব বেশ চৌকষ। আমাদের দেশে যে একেবারে নাই তা নয় তবে খুব বিরল সেটা যেন স্বভাবের ব্যতিক্রম। এরূপ ব্যতিক্রমের একজন উদাহরণ সুনীতিকুমার। যে ক্ষেত্রেই গিয়ে তিনি পড়ুন না কেন দেখা যায় বেশ মানিয়ে গিয়েছে। ইংরাজি প্রবাদের গোলাকার গর্তে চৌকোণা কীলক মোটেই নন। তাঁর জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ। তাঁকে সভাস্থলে দেখেছি, ক্লাসে দেখেছি। অধ্যাপক-দের বিরাম কক্ষে দেখেছি, স্বভবনে দেখেছি, কোথাও বেমানান নন। আরও দুটি ক্ষেত্রে দেখেছি তার মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদের সভাপতির আসনে। সবাই জানেন বিধান পরিষদের সদস্যগণ সবাই শান্তশিষ্ট নন, সুযোগ পেলে প্রবীণেও নবীনের মতো আচরণ করে থাকেন। কিন্তু কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেননি সভাপতি। দেশের হিতের জন্য বদ্ধপরিকর সদস্যদের ঠেকিয়ে

রাখা বড় সামান্য কথা নয়। তিনি যে সক্ষম হয়েছেন তার কারণ একসঙ্গে ধার ও ভার দু-ই ছিল তাঁর মধ্যে। পাণ্ডিত্যের ভার, ব্যক্তিত্বের ধারা। কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আশা, কোথায় বিধান পরিষদের সভাপতির আসন। কোথাও বেমানান নয়—এতো চোখের উপরে দেখা।

সুনীতিকুমারের আর এক রূপ সাহিত্যিকদের আড্ডায়। প্রথমে আড্ডা জমতো শনিবারের চিঠির অফিসে মোহনবাগান রো-তে। তিনি তখন সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ী থেকে উঠে গিয়েছেন বালিগঞ্জে। আড্ডার টানে আসতেন দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তরে। তারপর আড্ডা জমতো বঙ্গশ্রী পত্রিকা অফিসে, সেটা ধরমতলা স্ট্রীটে। মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতি পথে এসে জুটতেন, কাগজের ঠোঙায় চানাচুর, কিনেছেন ওয়েলিংটন স্ট্রীট আর ধরমতলার উত্তর পশ্চিম কোণের এক দোকান থেকে—সেদিন দেখলাম দোকানটা এখনো আছে।

সবাই বললাম, খান নি যে।

না এখন পথেঘাটে সব ছাত্র কেমন লজ্জা করে।

আড্ডাতেও ছাত্র ছিল, কিন্তু তারাও আড্ডাধারী চানাচুরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন। তাঁর গল্প বলবার টেকনিকটা আরব্যোপন্যাসের অন্তহীন গল্পমালার মতো। গ্রীক কোটেশন, বাংলার কথাশিল্প, ভাষাতত্ত্ব, একটু বা রাজনীতির চাটনি। পাশের লোকটিকে লক্ষ্য করে একটি লাটিন কবিতা বা ফারসী বয়েথ আবৃত্তি করলেন, হতভাগ্য লোকটা কিছুই বুঝলেন না, কিন্তু তাঁর ধারণা সবাই তাঁর মতো পণ্ডিত,। এরকম ব্যবহারের মূলে সমদর্শিতা, সবাই তাঁর কাছে সমান শুধু সামাজিক অবস্থায় নয় পাণ্ডিত্যেও। তাঁর চারিত্র্যের মূলে আত্মপ্রসন্নতা, ব্যক্তিত্বের মূলে সমদর্শিতা। সবাইকে বলেন আপনি, তা ছাত্রই হোক বা ছাত্রের ছাত্রই হোক, কেউ তাঁর কাছে ছোট নয়। পাণ্ডিত্যে, চারিত্র্যে, ব্যক্তিত্বে এমন দ্বিতীয় একটি লোক

আমার আর চোখে পড়ে নি। আমরা কি হারালাম এখনো সম্যক বুঝতে পারছি না, বড় ক্ষতি বুঝতে সময় লাগে।

তাঁর সন্তানগণ পিতৃহীন হল, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃহীন অগণিত ছাত্র, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানভিক্ষুর দল। আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞানদাতাকে বলা হয়েছে পিতা। সন্তবিয়োগের কাছে দাঁড়িয়ে এর অধিক কথন অমার্জনীয় বাচালতা গণ্য হবে আশঙ্কায় এখানেই নিরস্ত হলাম।

— প্রমথনাথ বিশী

বাঙালীর ভাষাপ্রীতি সুবিদিত; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের প্রতি তার কৌতূহল যৎসামান্য। আর ভাষাতাত্ত্বিকের যে মূর্তি আমরা মনে মনে তৈরি করেছি তা হল এক রসবোধহীন দুর্দান্ত পণ্ডিতের, শব্দের কচকচি নিয়ে তাঁর কারবার। বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসেই দু-একজন ব্যাকরণকার পণ্ডিতের নাম অবশ্য আমরা শুনি। তাঁরা মূলত জনচক্ষুর আড়ালে নিভৃতে কাজ করেছেন এবং নিঃশব্দেই আমাদের জীবন থেকে সরে গেছেন। বার্নাডশ' হেনরী সুইটের জীবন ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে পিগম্যালিয়নের প্রফেসার হিগিনসকে সৃষ্টি করেছিলেন। কোন বাঙালী লেখক কোন বৈয়াকরণকে তাঁর রচনার নায়ক করেননি। ব্রাউনিং তাঁর 'এ গ্র্যামারিয়ানস ফিউনারাল' কবিতায় এক বৈয়াকরণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন, কোন বাঙালী কবি আমাদের দেশের কোন ভাষাবিদের প্রতি এমনভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেননি। তবু আশ্চর্য যে সেই বাংলাদেশেই সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর বহু পূর্বেই বাঙালীর গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন এবং তাঁর বিদ্যাবত্তা ও ভাষাজ্ঞান প্রায় কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। উনিশশ' ছাব্বিশ সালে যখন সুনীতিকুমারের ইংরেজিতে লেখা বাংলাভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশ নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে

কয়েকজন সুধী পণ্ডিতের সামনে সুনীতিকুমারকে অভিনন্দন জানান। সেদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'এই ছোকরা মাতৃভাষার একটি সম্পূর্ণ ভাষাতত্ত্বমূলক ইতিহাস লিখিয়াছে, তাহা আমাদের সকলেরই গ্রহণযোগ্য। আমরা পুরাণ পদ্ধতিতে মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এ নূতন পথ দেখাইয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে এই ছোট ঘরোয়া মিলনে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে সেদিন একজন যুবক ভাষাতাত্ত্বিককে যিনি 'নূতন পথে' ভাষাচর্চা করেছিলেন, সমগ্র বাঙালীর পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করেছিলেন এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালীর ভাষাচিন্তার ইতিহাসে সুনীতিকুমারের আগে স্বল্প কয়েকজন মাত্রই ভাষার ক্ষেত্রে স্বাধীনচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন রামমোহন রায়। আর একজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সুনীতিকুমারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সম্ভবত আমাদের দেশের একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি বাংলাভাষার গঠনরহস্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং ব্যাকরণচর্চায় তাঁর জীবনের কিছু সময় ব্যয় করেছিলেন, তিনি সুনীতিকুমারের গ্রন্থের মহত্ত্ব বুঝেছিলেন। সুনীতিকুমারের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার মাত্র তিন বছর পরেই—অনুমান করি তখন ঐ গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা অঙ্গুলিমেয় ছিল—শেষের কবিতায় তার ঐতিহাসিক উল্লেখ—'ও পড়তে লাগলো সুনীতি চাটুজ্জের বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মতান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে, সেদিন সুনীতিকুমারের রচনা ও চিন্তার সঙ্গে কার কতটা মতান্তর ঘটেছিল আমরা স্পষ্ট করে জানি না, কিন্তু এটুকু জানি সুনীতিকুমারের প্রতি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও কৌতুহল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এক অসাধারণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল। সুনীতিকুমারের বাংলাভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ গ্রন্থটির বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। সুনীতিকুমার

এই পঞ্চাশ বছরে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এক মনীষীরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর বিদ্যাচর্চার সমস্ত সাফল্য ও অপূর্ণতাকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। আজ তাঁর কর্মবহুল দীর্ঘ জীবনের অবসানের পর সেই বিশাল ব্যক্তিত্বই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেইটেই স্বাভাবিক।

সুনীতিকুমার শুধু ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, যদিও তাঁর অন্যান্য সমস্ত কাজের উপরে তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়টাই অধিকাংশ বাঙালীর কাছে সবচেয়ে বেশী পরিচিত এবং সম্ভবত ভবিষ্যতের মানুষ তাঁর প্রধান পরিচয় জানবে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে হয় সুনীতিকুমার কি ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্থান কি ছিল। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্বে যাঁদের অধিকার তাঁরাই এর উত্তর দিতে পারবেন। আমরা শুধু এইটুকু জানি তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন ভারতবর্ষে নতুন করে ভাষাচর্চার জোয়ার দেখা দিয়েছে এবং সেই ভাষাচর্চায় অগ্রণী ছিলেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা। সুনীতিকুমারের ভাষাচর্চা শুরু করার বহু আগে ১৮৫৬ সালে রেভারেণ্ড রবার্ট কল্‌ডওয়েল, দ্রাবিড় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, আর ১৮৭২ সালে জন বীমস আধুনিক ভারতীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তার শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৯। আর ১৯২০ সালে সুনীতিকুমার যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজ-এর ছাত্র তখন জুল ব্লক-এর গ্রন্থ 'লা ফরমাশিওঁ দ্য লা লাং মারাথে' (মারাঠী ভাষার গঠন) প্রকাশিত হল। সুনীতিকুমারের সুবিখ্যাত 'বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থটিকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বলা যায় যে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারায় এটি স্বাভাবিকভাবেই পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করেছে। বাংলায় এই ধরনের কোন বই ইতিপূর্বে

লিখিত হয়নি। অন্য কোন ভারতীয় ভাষাতেও নয়। কিন্তু কলডওয়েল, বীমস এবং ব্লক—এই তিন পণ্ডিতের লেখাতেই ভারতীয় ভাষাচর্চার পথ তৈরী হয়েছিল। কলডওয়েল আর বীমস একগোষ্ঠীর অনেকগুলি ভাষাকে তাঁদের আলোচনার বিষয় করেছিলেন, ব্লক একটি ভাষাকে, তার গঠন, তার বিবর্তনকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছিলেন। সুনীতিকুমার মূলত ব্লকের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর আলোচনার কেন্দ্র বাংলা, কিন্তু বাংলাকে অবলম্বন করে সাধারণভাবে আধুনিক ভারতীয় ভাষার ইতিহাসের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। সেদিক থেকে সুনীতিকুমার কোন মৌলিক পথ দেখাননি। কিন্তু তিনি বাঙালী পণ্ডিতদের সামনে জুল ব্লকের কর্মপদ্ধতি বাংলাভাষায় প্রয়োগ করে ভাষাচর্চার নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সুনীতিকুমার কোন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক নয়, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতির একজন নিপুণ প্রযোজক।

সুনীতিকুমার যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা করছেন, তার বেশ কিছুদিন আগে ফার্দিনঁদ দ্য সস্যুর-এর ছাত্ররা, সম্ভবত ১৯১৫ সালে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর একটি বই বার করেন। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এই বইটির গুরুত্ব অসাধারণ। সুনীতিবাবু ফরাসী জানতেন এবং ভাষাচর্চার সূত্রে কয়েক বছর ফরাসী দেশে ছিলেন। অনুমান করি সে সময় সুনীতিবাবু এই বইটি পড়েছিলেন। এই বইতে ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে এককালীনতা এবং বহুকালীনতার প্রসঙ্গ তুলেছেন দ্য সস্যুর। একটা ভাষাকে দেখা যেতে পারে বহমান ধারা হিসেবে। ভিন্ন ভিন্ন কালে তার পরিবর্তনের রূপ তাই ভাষাতাত্ত্বিকের আলোচনার প্রধান লক্ষ্য। বলাবাহুল্য ভাষার পরিবর্তন এবং তার ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ব্যাকরণকারদের প্রায় সমগ্র শক্তি ও কৌতূহল অধিকার করেছিল। সুনীতিবাবুও মূলত এই পথের পথিক। দ্য সস্যুর বলেছিলেন, ভাষা বিচারের বা বিশ্লেষণের আর একটা পথ আছে, তা হল একটি ভাষাকে একটি নির্দিষ্টকালের

পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা, সেখানে অন্য কালের প্রসঙ্গ আনা হবে না। সুনীতিকুমার ভাষাকে 'বহতা নদী' হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। ভাষা-বিচারে এককালীনতার প্রসঙ্গ তাঁকে খুব চিন্তিত করেননি।

দ্য সস্যু্র ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষার বাইরের ইতিহাস আর ভেতরের ইতিহাসের পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা তথা অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় ভাষার ইতিহাস সম্প্রর্কিত বই দেখলে দেখা যাবে এই বাইরের এবং ভেতরের ইতিহাসের পার্থক্য সম্বন্ধে বোধ প্রায়ই অস্পষ্ট। সুনীতিকুমার এই পার্থক্যটা স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর গ্রন্থে। ভেতরের ইতিহাসটাই ভাষা-তাত্ত্বিকের কাছে সবচেয়ে দরকারী। কিভাবে গঠনের পরিবর্তন হয়েছে। কোন কোন পরিবেশে কোন কোন অবস্থায় গঠনের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে নতুন গঠনের উদ্ভব হচ্ছে—এই হল ভেতরের ইতিহাসের মূল প্রশ্ন। সুনীতিকুমার সেই ইতিহাসের কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবত সেই জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এখানে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সুনীতিকুমারের গ্রন্থের একটা প্রভাব পড়েছিল ভারতবর্ষে। তাঁর বইটির মডেলে কয়েকটি ভারতীয় ভাষার ইতিহাস রচিত হয়েছিল। তাদের মূল্য কতটা জানি না। এই বইটি সুনীতিকুমারকে ভারতবর্ষে খ্যাতিমান করেছিল এবং তাঁকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব চর্চার এক নতুন যুগের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য সুনীতিকুমার তাঁর বিপুল প্রতিভা ও মেধা সত্ত্বেও সেই নতুন যুগের সৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহী হননি।

অমিত রায়ের সঙ্গে সুনীতিকুমারের মতান্তর শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু মতান্তর হবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। যখন সুনীতিকুমার বাংলাদেশে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ঠিক সেই সময়েই ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে একটা বিরাট দিক পরিবর্তন ঘটেছিল।

বিশেষভাবে একজন ব্যক্তির কথা যদি উল্লেখ করতে হয় তিনি লেওনার্ড ব্লুম্‌ফিল্ড। সুনীতিবাবু ভাষাতত্ত্বের এই দিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে এই নতুন রীতি ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান নি। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে যখনই কোন কথা হয়েছে তখন দেখেছি বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা গঠনভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত। ব্লুমফিল্ড বা ব্লক বা হ্যারিস সম্বন্ধে—তাঁদের বিশ্লেষণ পদ্ধতির সম্বন্ধে তিনি প্রায় উদাসীন ছিলেন। অর্থাৎ আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জগৎ থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। আর উনিশ শ' সাতান্ন সালে নোয়াম চম্‌স্‌কির 'সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার' গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হল আর তার ফলে ভাষাতত্ত্বের জগতে আর একবার যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল তার গুরুত্ব সুনীতিকুমার আদৌ অনুধাবন করতে পারেন নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সুনীতিকুমার আমাদের ভাষাচর্চার ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শ' ছাব্বিশের পর ভাষাতত্ত্বে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই। আর আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সুনীতিকুমার ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পদ্ধতি বা মৌলিক চিন্তার জনক নন। বিংশ শতাব্দীর কোন শ্রেষ্ঠ ভাষা-তাত্ত্বিকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে আমরা কোন আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি না। এমন কি যে ব্যাপারে তাঁর প্রতি আমাদের আশা ছিল সবচেয়ে বেশী, যে তিনি একটি সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর সার্থক বাংলা ব্যাকরণ লিখবেন, সেখানেও তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করেন নি।

সুনীতিকুমারের শক্তি এবং প্রতিভা সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার অনেক কারণের প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে তিনি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতিভাকে নানা পথে চালিত করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তিনি বাংলাকেই তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র করেন নি। বিভিন্ন ভারতীয় আর্যভাষা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, হিন্দী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র

গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্রাবিড় ভাষাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল, তোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধেও তিনি পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু শুধু ভারতীয় ভাষা ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বকেই তাঁর চিন্তা-ভাবনার জগৎ করতে তিনি রাজী হননি। বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানেও তার প্রতিভার অস্থিরতা কিংবা তাঁর আগ্রহের ও ক্ষমতার বহুমুখিতা। মধ্যযুগ, উনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দী—সমস্ত যুগের লেখক ও লেখার তার আগ্রহ। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যকেও তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু করতে চেয়েছেন, যার ফল তাঁর ইংরেজিতে লেখা আধুনিক ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্য বইটি। এবং ভারতীয় সাহিত্যই শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে তাঁর কৌতূহল ছিল, অধিকারও ছিল।

কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যই শুধু নয়, সুনীতিকুমারের আগ্রহ সংস্কৃতির ইতিহাসে। শিল্পসাহিত্য দর্শন, মানুষের খাদ্য পরিচ্ছদ গৃহনির্মাণ, ইতিহাস ও সমাজ—সব মিলিয়ে মানুষের যে বিরাট ব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক জীবন এবং সামাজিক জীবন তার প্রতি সুনীতিকুমারের বিপুল আগ্রহ। তাই একদিকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মোঙ্গোলোয়ড্-এর দান ও স্থান নির্ণয় করেছেন, অন্যদিকে বল্‌টদের সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করছেন, একদিকে লিখছেন আফ্রিকার সংস্কৃতি সম্বন্ধে আর একদিকে দ্বীপময় ভারতের কথা। একটা অসাধারণ ব্যাপ্তি, অসাধারণ কৌতূহল এবং প্রায় সাধারণ জিজ্ঞাসা। সুনীতিকুমারের এই ব্যাপ্তি, কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা তাঁর সেই ব্যক্তিত্বকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তিনি যে কোন সাধারণ কথাবার্তায় তাঁর সেই ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন অনায়াসে, তাঁর শ্রোতারা মুগ্ধ, চকিত এবং প্রায় বিমূঢ় হয়ে যেত তাঁর তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিতে, তিনি কখনও ঋগ্‌বেদ, কখন ইলিয়াড থেকে আবৃত্তি করতে পারেন, কখনও ইথিওপিয়ার ইতিহাস বলে যেতে পারেন অনর্গল, কখনও মেকসিকোর রন্ধন-প্রণালী সম্বন্ধে বলতে পারেন,

কখনও চন্দ্রগুপ্তের আমলের সৈনিকদের বেশভূষা, আবার কখনও অতি পরিচিত বাংলা শব্দের ইতিহাসের পশ্চাদ্ধাবন করে পৌঁছে যেতে পারেন ইন্দো-ইউরোপীয় উৎসে। এবং যে কোন আলোচনা সভায় সুনীতিকুমার প্রায় জাদুকরের মত তাঁর শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। তবু শেষ পর্যন্ত সুনীতিকুমার ভাষাতাত্ত্বিক বা ফিলোলজিস্ট। আজকের দিনের ভাষাতাত্ত্বিকেরা নিজেদের সঙ্গত কারণেই ফিলোলজিস্ট বলেন না, আজকের দিনের ভাষাতাত্ত্বিকের ক্ষেত্র ভিন্ন। এবং ফিলোলজিস্টের থেকে স্বতন্ত্র। সুনীতিকুমারের সমস্ত কর্মজীবন অনুধাবন করলে তাঁকে খুবই সঙ্গতভাবে ফিলো-লজিস্ট বলব কারণ তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা, লিখিত সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা।

আমাদের অনুজেরা সুনীতিকুমারকে জানবে একজন বহুমুখী বহু জিজ্ঞাসু ব্যাকরণকার হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিত্বের যে জাদু আজ আমাদের কাছে এত স্পষ্ট তা তখন আর থাকবে না। আমরা যে সুনীতিকুমারকে দেখেছি তাঁর বহু লক্ষণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় তাঁর চরিত্রের তারুণ্য এবং প্রতিপক্ষের প্রতি মর্যাদাবোধ। সেই জন্যই তাঁর সঙ্গে মতান্তরে বিরূপতা ছিল না। ছিল সঙ্ঘাতের উত্তেজনা। সুনীতিকুমারের বিপুল ব্যপ্তি ও বহুধা বিস্তৃত জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বাঙালীর সামনে শুধুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় হয়ে যেন না থাকে, তা যেন বাঙালীর তারুণ্য ও মনীষাকে উদ্বুদ্ধ করে মতান্তরে, সুনীতিকুমারের দৃষ্টান্ত প্রসারিত করুক নতুন চিন্তার ক্ষেত্র। তাঁর ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা ত্বরান্বিত করুক আজকের বাঙালীর পূর্ণতা ও সফলতার সাধনা। সুনীতিকুমারের প্রতি সেই হবে আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—শিশিরকুমার দাশ

১৯৭২ সালের জুন মাসই হবে বোধহয় তখন। সূর্যদেবের দারুণ অগ্নিবানে যেন গোটা দেশটা জ্বলে যাচছে। আকুল আকাশে মেঘের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু প্রবীণ আচার্যদেব সেই দারুণদহনজ্বালা অগ্রাহ্য করে যথাসময়ে ( তিনটে নাগাদ ) বাগনানের 'আনন্দ-নিকেতনে' এসে হাজির হলেন। শাঁখ ঘণ্টার মাধ্যমে উদ্যোক্তারা অভ্যর্থনা করলেন আচার্যদেবকে ও ঘোষণা করলেন তাঁর আনন্দসংবাদ। সভার কাজ শুরু হল।· ভাষণ দিতে উঠে তিনি ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন যে আনন্দ-নিকেতনের প্রাঙ্গণ জুড়ে বসে রয়েছে শ্রদ্ধাশীল জনমণ্ডলী। প্রসন্ন হাসি হেসে তিনি আরম্ভ করলেন।—'আজ এই দুরন্ত গরমের দিনে আপনারা কষ্ট করে আমার কথা শুনতে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত। আমার জীবনের প্রথমদিকের অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলছি। তখন আমার কথা শুনতে বড় একটা কারুর গরজ ছিল না। তাই উদ্যোক্তারা আমার বক্তৃতার পর একটি ম্যাজিক বা অভিনয়ের ব্যবস্থা রাখতেন। লোক জড়ো করা ও তাদের আটকে রাখার কৌশল আর কি ? বক্তৃতা শুনতে শুনতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়ই অস্থির হয়ে পড়ত। তখন তাদের সামলাতে বেশ বেগ পেতে হত শিক্ষকদের। তাদের কথার দু'চারটে টুকরো বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে আমার কানে ভেসে আসতো—মন দিয়ে শোনো, সব। ইনি একজন প্রচণ্ড পণ্ডিত লোক। তবে দু'চারখানা এমন বিদ্‌ঘুটে বই লিখেছেন যার একবর্ণও বোঝা যায় না।' তারপর তিনি বাংলার কৃষ্টি, সাহিত্য ও সাধনার প্রসঙ্গে চলে গেলেন। দ্বিতীয়বার তাঁর সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য হয় রবিবার ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৬ সাল। প্রায় ৯টা নাগাদ তাঁর বাড়ীতে গেলাম—'সুধর্মা'য়। স্বনামখ্যাত ডঃ মদনমোহন কুমার আমাকে সঙ্গে করে দোতালার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী জ্ঞানবৃদ্ধ সুনীতিকুমার বসে আছেন একটি হাতলহীন চেয়ারে ; অটুট স্বাস্থ্য, খালি গা এবং পরনে একটি ফিকে বাদামি রঙের সাদামাটা লুঙ্গী। আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই

আমাকে বসতে বললেন। তারপর আচার্যদেব বেশ তেজী গলায় ও সরসভঙ্গীতে কথা বলে চলেছেন। কথার টানে যখন যে বিষয় তাঁর মনে আসছিল, তাই তিনি বলছিলেন। একফাঁকে একটি বই তাঁর হাতে তুলে দিলাম এবং ডঃ কুমার বইটি সম্পর্কে দু'চার কথা বলেও দিলেন। আচার্যদেব বললেন—'বেশ! ভালো কথা।'

সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন পণ্ডিতদের কথায়—'পণ্ডিতেরা কথার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে কতই না মাথা ঘামান। কিন্তু তাতে লাভ কি? এই যে আমাদের ঝি-বেটি—সে তো লেখাপড়ার কোনো ধারই ধারে না। সে কিন্তু পাড়ার দুর্গা প্রতিমা দেখে এসে বলে বেড়াচ্ছে—'সর্বজনীন পূজো দেখে এলাম'। দেখুন মায়ের আসল রূপটি কেমন সহজে সে ধরে ফেলেছে। সার্বজনীন—কোন কথাটা ব্যাকরণমতে শুদ্ধ এ সব তত্ত্ব সে জানে না বলে কি তার এসে গেলো?' তারপর তিনি বইটি দেখতে লাগলেন। 'রুক্মিণী হরণ'-এর পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিটির শেষে 'ওঁ তৎসৎ' এই কথা কটি দেখে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—'হ্যাঁ, এইটুকুই ঠিক। তিনিই আছেন। আইন্‌স্টাইন্‌ও তাই বলেন। তাঁর কথা চিন্তা করলে আমাদের মনে যে ভাব জাগে তাকে 'Rapturous amazement বলা যেতে পারে।' ইংরেজী কথা দুটির ওপর যেন তিনি হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উজাড় করে দিলেন। এমন সময় বিশ্ববাণীর 'মহাভারতম্'-এর প্রথম খণ্ডটি এগিয়ে দিলাম। তিনি কয়েক মিনিট থেমে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের উদ্দেশ্যে বললেন—'একজন নীরব কর্মী। এমন লোক আজকাল আর হয় না।' বইটি দেখতে দেখতে তিনি বলে চললেন—'তিনি ছিলেন একজন four—dimensional figure গোটা মহাভারত সভায় বসে তিনি পাঠও করেছেন অনেকবার।…তাঁর সব বইগুলি কি দেখেছেন? প্রতিটি বইতে একটি করে মঙ্গলাচরণ আছে। চমৎকার রচনা। সবগুলি এক জায়গায় করলে একটি অপূর্ব স্তোত্রমালা হয়ে যায়।' এই বলে তিনি সিদ্ধান্ত-

বাগীশ মশায়ের 'মহাভারতম্'-এর 'ভারতকৌমুদী' কার প্রারম্ভিক শ্লোকটি উদাত্ত গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করে ব্যাখ্যা করলেন। ( মূর্তিশূন্যমপি সর্বমূর্তিকং মৃত্যুহীনমপি শাশ্বতং শবম্। শ্রৌতশান্তমপি চোগ্ররূপিণং নৌমি চিত্রচরিতং মহেশ্বরম্ ॥) । হাতে-লেখা মহাভারতের প্রতিলিপি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'কার লেখা?'। বললাম—'সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের পিতামহ কাশীচন্দ্রের'। পুরো মহাভারতই তিনি এমন সুন্দর করে পুঁথির আকারে লিখে রেখে গেছেন শুনে আবিষ্টভাবে বললেন—'এসব লোকের নাম করলেও পুণ্য হয়।' তারপর তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্তবাগীশ মশায়ের পূর্বপুরুষ পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতীর কথায় এসে গেলেন—'তাঁর 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র নাম শুনেছেন তো? এমন মহাগ্রন্থ খুব কমই আছে।' এরপর তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে শ্রদ্ধাসিক্ত গলায় বললেন—'গুরুদেবকে আমরা পেয়েছিলাম বহুপুণ্যফলে। আবার এমন একজন মহামানবের জন্যে পৃথিবীকে বহু যুগ অপেক্ষা করে থাকতে হবে।' শিখধর্মের প্রতিও কথায় কথায় তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে দেখে তাঁকে প্রণাম করে আমরা বিদায় নিলাম।

—পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য

'আমার মৃত্যু হবে বিদেশে, ভারতের বাইরে। একজন এস্ট্রলজার আমাকে একথা বলেছেন।...'স্মৃতিশক্তি বিভ্রম হয়ে, অথর্ব হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ঢের ভাল। আমাকে যেন ওভাবে বেঁচে থাকতে না হয়।'—ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনই এই কথাগুলি উনি আমাকে বলেছিলেন তাঁর 'সুধর্মার' দোতলার বারান্দায় বসে।

মাত্র আড়াই বছর আগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন সামান্য গবেষক হিসেবে তাঁর কাছে গিয়েছিলুম এক সমস্যার সমাধানে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী

হয়ে। কাজের কথা শেষ হতেই উনি প্রশ্ন করলেন, 'পার্থিব জগতের বাইরের কোনো বিষয়ের ওপর আপনার কি কোন আগ্রহ আছে? প্ল্যানচেট এস্ট্রলজি এসব 'আপনি' বিশ্বাস করেন?' ভাষাচার্যের মুখে এই জাতীয় প্রশ্ন শুনে একটুও আশ্চর্য হইনি, আশ্চর্য হলুম জাতীয় অধ্যাপকের মুখে 'আপনি' সম্বোধন শুনে। অবশ্য পরে বুঝেছিলুম, সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করা এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে না দেওয়াটাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বললুম, আমার এসব বিষয়ের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ আর কৌতূহল আছে। তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারি না।

আচার্য বললেন—আমি এসব বিশ্বাস করি না। একজন এস্ট্রলজার বলেছেন আমার মৃত্যু হবে ভারতের বাইরে। হয় হোক, যেন সজ্ঞানে মরতে পারি। ডঃ সুশীল দের মতো স্মৃতিবিভ্রম হয়ে, অথর্ব জবুথবু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ঢের ভাল। আমাকে যেন ওভাবে বেঁচে থাকতে না হয়। একটু থেমে বললেন, আমার পঁচাশি বছর বয়স হল, এখনো স্মৃতিশক্তি লোপ পায়নি।···

এই বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে প্রথম সাক্ষাতের দিনই আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি। কথাবার্তায় তিনি এত অন্তরঙ্গ যে কখন তাঁর কাছে সঙ্কোচ কাটিয়ে সহজ হয়ে গেছি তা নিজেও বুঝতে পারিনি। বলেছি, যা কিছু চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, তা কি সব মিথ্যে? আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাই তো সীমাবদ্ধ। আজ হিউস্টনের বিজ্ঞানীরাও আশ্চর্য হচ্ছেন সেই কেন্দ্রীয় মহাশক্তির কথা স্মরণ করে যা কোটি কোটি সূর্য বা সানগ্যালাকসিকে নিজের চারপাশে ঘোরাচ্ছে। আমরা কি সেই অপার্থিব মহাশক্তিকে অস্বীকার করতে পারি? আচার্য ঘাড় নেড়ে একথার সমর্থন জানালেন। বললুম, এমন জ্যোতিষী দেখেছি যার বহু কথা মিলেছে আবার ভুলও হয়েছে। আর প্ল্যানচেটে ভৌতিক শক্তির শক্তি পরীক্ষা

করতে একদিন কাঁচের গোল বড় পেপারওয়েট এক খণ্ড কাগজের ওপর চলাফেরা করিয়েছিলুম দুই বন্ধুতে মিলে। আপনি আমাকে বলুন, এটা কি করে সম্ভব হল ? অদৃশ্য শক্তি একটা কিছু আছেই।

আচার্য বললেন—এ ব্যাপারে সম্প্রতি কোন বই পড়েছেন—অমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' পড়েছেন ?

পড়েছি—ভীষণ ভাল লেগেছে !

বললেন—আমার খুব ভাল লাগল। তবে রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করতেন না। ভূমিকাতে অমিয় চক্রবর্তী সেকথা লিখেছেন।

আমি বললুম, বইটা পড়ে আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়েছে। দশ বছর আগের রবীন্দ্রনাথ আর দশ বছর পরের রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট করার মধ্যে কোথায় যেন একটা পার্থক্য আছে। পরলোকগত আত্মাকে প্রশ্ন করার ধরন দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ যেন অবচেতন মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন।

আচার্য বললেন—এটা একটা সাময়িক ব্যাপার! জীবনের বিভিন্ন সময়ে এক-একটা পাগলামি তাঁর মাথায় চেপে বসতো। আসলে তিনি ওসব বিশ্বাসই করতেন না।

বললুম রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের কথা বাদ দিলুম। কিন্তু মিডিয়ম করে প্ল্যানচেট যদি মিথ্যে হয় তবে সতেরো বছরের মেয়ে বুলার ( মিডিয়াম ) পক্ষে কি করে সম্ভব রবীন্দ্রনাথ যাঁর সঙ্গে যে ভঙ্গীতে কথা বলতেন সেই ঢঙ নকল করে কথা বলা ? বুলার জন্মের আগেই তো অনেকে মারা গেছেন। কিংবা আত্মার স্বরূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এধরনের দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সতেরো বছরের মেয়ের পক্ষে কি করে সম্ভব ? তাছাড়া ব্যক্তিগত বহু ঘটনার কথা বইতে আছে যা রবীন্দ্রনাথ ও পরলোকগত আত্মা ছাড়া তৃতীয় কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা করা যায় না তাকে কি করে অবিশ্বাস করি।

**—সুশান্তকুমার মিত্র**

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। পূজার ছুটির আগে আমার অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা একদিন বললেন, সুনীতিবাবু আসছেন, তিনি পূজার পরেই কাজে যোগ দেবেন। সুনীতিবাবু বিলেতে থাকতে থাকতেই ধ্বনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন, সে-কথা আমরা সকলেই জানতুম। অধ্যাপক মহাশয়কে বললুম, সুনীতিবাবু তো আমাদের শুধু ফোনেটিক্সই পড়াবেন। ডক্টর তারাপুরওয়ালা বললেন, তিনি সব পেপারই পড়াতে সমান সমর্থ। ছুটির পরে যেদিন ক্লাস খুলল সেদিন চারটের পর বাড়ি যাচ্ছি, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর একতলার পূর্ব-উত্তর দিকের সিঁড়িতে নামছি, এমন সময় কে একজন দেখিয়ে দিলে, উনি সুনীতি বাবু। এর দু-একদিন পরেই তাঁর আবির্ভাব হলো আমাদের ক্লাসে। যে ক্লাস বসত দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর চারতলায় পূর্ব দিকের একটি ঘরে। সেদিন ক্লাস ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের। সংস্কৃতের ছাত্ররাও আমাদের সঙ্গে ক্লাস করত। তার কারণ পাঠ্য-বিষয় মোটামুটি একই এবং অধ্যাপক এক ব্যক্তি—ডক্টর তারাপুরওয়ালা। সুনীতিবাবু চার বছর বিলেতে থেকে নবীন জ্ঞান আহরণ করে ফিরেছেন, তাই অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা তাঁকেই ঐ বিষয় পড়াতে দিলেন। আরও হয়ত একটু ভিতরে কথা ছিল, তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছি। সংস্কৃতের ছেলেদের সঙ্গে আমাদেরও ক্লাস হত বলে পড়ানো ছিল খাবলা খাবলা রকমের—সংস্কৃত পাঠ্যবস্তুর দিকে নজর রেখে। কথাছিল আমাদের দু'জনের ( কম্প্যারেটিভ ফিললজির ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে আমরা তখন মোট দু'জন ছাত্র ছিলুম ) জন্যে পরে অতিরিক্ত কিছু ক্লাস নেওয়া হবে, কিন্তু তা ততদিন পর্যন্ত

ঘটে ওঠেনি। এখন তাই সুনীতিবাবুকে তা পড়াবার ভার দেওয়া হল। তাদের কিছু অতিরিক্ত পড়াবার ফলে সংস্কৃতের ছেলেরা একটু মুস্কিলে পড়ল। সুনীতিবাবু গোড়া থেকে বিদ্যুৎগতিতে ধারাবাহিক-ভাবে পড়ানো ধরলেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ক্লাসরুমে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। সে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসের কথা।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমাদের ক্লাস করা শেষ হয়ে গেল। অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা বললেন, আমি শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি, সেখানে মাসখানেক থাকব আর ইরানীয় বিদ্যার উপর বক্তৃতা দেব। তুমি তো এইবার থিসিস লেখায় হাত দেবে; তা'হলে আমার সঙ্গে যেতে পার। সেখানে ভিণ্টারনিটজ আছেন, লেসনি আছেন, মার্ক কলিনস রয়েছেন। তাঁদের কাছে তোমার থিসিসের বিষয়ে কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য থাকলে জেনে নিতে পারবে। আমি রাজি হলুম। সেই আমার প্রথম শান্তিনিকেতনে যাওয়া।

ক্লাস বন্ধ হবার পর সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হল। আগে একদিন ক্লাসের শেষে আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, এবিষয়ে আমার কাছে মেইয়ের বক্তৃতার নোট আছে, আমার বাড়ীতে আসবেন আমি দেব। (সুনীতিবাবু সব ছাত্রকেই আপনি বলে সম্বোধন করতেন। এবিষয়ে তাঁর একটু 'ফিলজফি' আছে। সে ফিলজফি এখনকার দিনে ক্লাস করতে হলে রাখতে পারতেন কিনা সন্দেহ)। আমার সঙ্কোচ হল। যদিও আমার বাড়ী সিকি মাইলের মতো দূরে, তবুও। আমি বললুম আপনি যদি কাল-পরশু নিয়ে আসেন ভালো হয়। আমি দু-একদিন রেখে ফিরিয়ে দেব। তিনি তাই করেছিলেন।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাৎ শুরু হল ডিসেম্বর মাস নাগাদ। তখন ইউনিভার্সিটি প্রেস ছিল সেনেট হাউসের পিছনে

টানা টালির ঘরে। প্রেস স্থপারিন্টেডেন্টের অফিস ছিল সেনেট হাউসের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরে ও তার সংলগ্ন অংশে। আজ সে টানা টালির ঘরও নেই, সেনেট হাউসও নেই। টালির ঘরের মাঝখানে যাতায়াতের সরু করিডর ছিল।

সেই ছিল সেনেট হাউস ও দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের সংযোগ পথ। রবীন্দ্রনাথ কতবার সে পথ দিয়ে সেনেট হল থেকে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে এসেছিলেন, তাঁর পিছু পিছু দু-চারজনের সঙ্গে আমিও আসতুম—সে ছবি আজও মনে জ্বলজ্বল করছে। যাক সে কথা।

স্থনীতিবাবুর কাছে যাই সকালে সপ্তাহে তিন দিন করে। তাঁর কাছে বসে নানা কথা শুনি নানা লোক দেখি কারো কারো সঙ্গে পরিচয় হয়। সে চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স। যে-কালের কথা বলছি, সেকালের অল্পবয়সী আমরা বয়স্ক লোকদের সঙ্গে সমীহ আচরণ করতুম। এটা চিরাচরিত পারিবারিক শিষ্টাচার অভ্যাস তো বটেই। বিশিষ্ট সামাজিক সদাচার শিক্ষাও ছিল। যাঁরা বয়সে বড় এবং বিদ্যা-বুদ্ধিতে উন্নত অথবা গণ্যমান্য তাঁদের প্রতি আপনা থেকেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগত। এখনকার দিনের অল্পবয়সীদের সে ভাব জাগে না। দোষ তাদের নয়। তাদের মনে সাম্যবোধ গেড়ে বসানো হয়েছে। ভোট দেবার সমান অধিকার ছোট-বড় সকলকে সমান ভূমিতে এক সারিতে জড় করেছে। পরীক্ষার ছাপ জ্ঞান-বুদ্ধির গ্যারান্টি দিয়েছে। আমরা সবাই এখন যেন শিব বিবাহের বরযাত্রী। তাই বয়স্কদের প্রতি সমুচিত শিষ্টাচার এখনকার অল্পবয়সীদের মনে বিসদৃশ ঠেকবে। দোষ সবটাই তাদের নয়, অনেকটা তাদের বাড়ীর লোকদের ও আত্মীয়স্বজনের এবং বাকিটা ইস্কুলের শিক্ষকদের। শিশু-পুত্রের সঙ্গে পিতার বয়স্যবৎ আলাপ আমাদের কালে অজ্ঞাত ছিল। মনের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চয় ছিল বলেই স্থনীতিবাবুর আসর প্রান্তে বসে যাঁদের ক্ষণিক সাক্ষাৎ

পেয়েছিলুম তাঁদের অনেকের কাছ থেকে মনের ভাণ্ডারে কিছু না কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছিলুম।

১৯২৪ সালের পূজার পর একদিন সুনীতিবাবুর কাছে গিয়েছি। তিনি বললেন, শান্তিনিকেতনে স্টেন কোনো আসছেন; সেখানে তিনি মাস তিন-চার থাকবেন। আমি ভাবছি তাঁর কাছে সপ্তাহে সপ্তাহে পড়তে যাব, আপনিও চলুন না কেন! স্টেন কোনো বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, তিব্বতী ও চীনা জানেন। তাঁর কাছে শেখার সুযোগ পাব। আমি তখুনি রাজি হলুম। তার পরের সপ্তাহ থেকে তিন মাস ধরে প্রত্যেক সপ্তাহান্তিক শান্তিনিকেতনে পাঠার্থে গমনাগমন চলল। শুক্রবার সন্ধ্যার ট্রেনে গমন, রবিবার সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। সপ্তাহে দু'দিন দু'বেলা করে পাঠগ্রহণ। কোনো তখন Corpus Inscriptionem Indicarum গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড খরোষ্ঠী অনুশাসনগুলির সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে শক ও খোটানি টেকস্‌ট পড়াতে ও চীনা শেখাতে শুরু করলেন। সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমিও দুটি ক্লাসই করতে লাগলুম। আমাদের সঙ্গে অল্পবিস্তর নিয়মিতভাবে ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, ফণীন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র, শ্রীযুক্ত নিতাই বিনোদ গোস্বামী, ক্ষিতিমোহন সেন এবং আরও কেউ কেউ। সবশুদ্ধ কোনদিনই পাঁচ-ছ' জনের কম ছাত্র উপস্থিত থাকতেন না। বলাবাহুল্য সবচেয়ে বেশী সংখ্যা উপস্থিত ছিল প্রথম দিনে। প্রথম দিনে কালিদাস নাগ মহাশয়ও হাজির ছিলেন। তিনি পরেও মাঝে মাঝে ক্লাস করতেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাপক স্টেন কোনোর নাম অনুবাদ করে রেখেছিলেন পৈল কণ্ব ভট্ট। প্রথম বারে যখন শান্তিনিকেতনে যাই, বছর দেড়েক আগে, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে এসেছিলুম শিক্ষার্থীরূপে। এখন তাঁকে দেখলাম সহশিক্ষার্থীরূপে, পরে কলকাতায় পেয়েছিলুম সহকর্মীরূপে। তিন রূপেই তিনি আমার

শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি সমানভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। তাই আজও শাস্ত্রী মহাশয়কে না ভেবে সেকালের শান্তিনিকেতনের ছবি মনে জাগাতে পারি না।

অধ্যাপক কোনো যেদিন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন হয়ত তার আগের দিন, ঠিক মনে নেই---তিনি গিয়েছিলেন আশ্রমের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে বিদায় নিতে। অনেকের মতো আমিও সেই সঙ্গে ছিলুম। দ্বিজেন্দ্রনাথ হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন লম্বা কেদারায়, নীচু বাংলার বারান্দায়। কোনো নত হয়ে প্রণাম করে বললেন, আমি আশ্রম থেকে বিদায় নিতে এসেছি। তখন সেই প্রজ্ঞা মূর্তি সুপক্ক বৃদ্ধ অধ্যাপক কোনোর কেশবিরল মাথায় কম্পমান শীর্ণ ডান হাতখানি রেখে কাঁপা কাঁপা গলায় থেমে থেমে পড়লেন কালিদাসের একটি শ্লোক : আশ্রমত্যাগিনী শকুন্তলার প্রতি কন্বের বিদায়বাণী—সন্তানের প্রতি পিতার চিরন্তন শুভযাত্রা-আশীর্বাদ। সেই মুহূর্তে কালিদাস ও কন্ব যেন আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে কোনোর কাছে পড়তে যাবার সময়ে সুনীতিবাবুর স্নেহশীল হৃদয়ের পরিচয় প্রথম অনুভব করি। ডিসেম্বর মাসের শেষ, সেবার প্রচণ্ড শীত পড়েছে শান্তিনিকেতনে। সেবারে আমরা ছিলুম পশ্চিম দিকের বড় ঘরটায়। পৌষ উৎসব উপলক্ষ্যে আরও দু-একজন এসেছিলেন বলে সকলের জন্যে ঢালাও বিছানা হয়েছিল মেঝেতে। আমার গায়ে দেবার ছিল একটিমাত্র পাতলা কম্বল। সেইটি গায়ে জড়িয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমোবার আগে ভেবেছিলুম শীতের চোটে রাত্রিতে বার বার ঘুম ভাঙবে। ঘুম কিন্তু এক টানাই হল। সকালে উঠে দেখলুম আমার কম্বলের উপর একটা মোটা ভারি কম্বল চাপানো রয়েছে। বুঝলুম রাত্রিতে আমার অবস্থা অনুভব করে সুনীতিবাবু কম্বল আনিয়ে আমার উপর চড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অনেক দিন পরের একটি ছোট ঘটনার কথা মনে

পড়ছে। ব্যাপারটা কিন্তু আমার পক্ষে গৌরবের নয়। ১৯৪৬ সালে নাগপুরে ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্স বসেছে। একদিন সকলকে নিয়ে যাওয়া হল প্রায় তিরিশ-বত্রিশ মাইল দূরে রামগড় পাহাড়ের উপরে পুরা কীর্তি দেখবার জন্যে। সকালে ন'টার সময় আট-দশ বাস ভর্তি দর্শক পাহাড়ের গোড়ায় এসে নামল। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য ছিল রাজকীয় রকম ব্যবস্থা। প্রথমেই জলযোগ।

সকলে হুড়মুড় করে অভ্যর্থনা তোরণ বরাবর সটান ভিতরে চলে গেলেন ভোজনশালার দিকে। লোভী ভদ্রলোকের অসংযত ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতে আমার মন গেল না। আমি ভিড়ের বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসে রইলুম। ভিতর থেকে সকলে ফিরে এলে সকলে মিলে উপরে উঠব। একটু পরে সুনীতিবাবু ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে বসে থাকতে দেখে বললেন, চা খেয়েছেন তো? আমি বললুম, কই চায়ের তো ব্যবস্থা দেখছি না! তিনি বললেন, যান যান, ভিতরে সবাই চা খাচ্ছে। আমি বললুম, এ ভিড় ঠেলে চা খেতে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না আর চা তো নাগপুরে খেয়েই এসেছি। সুনীতিবাবু জানেন, আমি চা কিছু বেশীবার খাই। তাঁর ভালো লাগল না। কিছু না বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন এবং একটু পরে গরম এক কাপ চা এনে আমাকে দিয়ে বললেন, নিন, খান। আমি তো যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞচিত্তে সেই ঠাণ্ডায় গরম চা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। তারপর সমস্যা হল চলন্ত লোকের ভিড়ের মধ্যে খালি এঁটো কাপটা রাখি কোথায়! কাপ হাতে করে সেই বেঞ্চিতেই বসে রইলুম, কোনো ভলান্টিয়ার এসে যদি নিয়ে যায়, এই আশায়। একটু পরে আবার সুনীতিবাবুর আবির্ভাব, 'কি কাপটা' রাখতে পারছেন না? দিন।' বলে আমার হাত থেকে এঁটো কাপটা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি ভিড় ঠেলে ভিতরে চলে গেলেন সেটা রাখতে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে করে দুঃখ হল। সুনীতিবাবুর নিরভিমান আর এক দুর্লভ পরিচয় পেয়ে আনন্দও হল।

বৈষ্ণব ভাবনায় শিক্ষার ভারমুক্ত হলে পর গুরু হন সেথো। সেথো হলেন পুণ্যতীর্থের বাসিন্দা যিনি অজ্ঞ-অনভিজ্ঞকে পথ দেখিয়ে তীর্থে পৌঁছে দেন। (সেথো মানে 'সাথী' নয়। শব্দটি এসেছে "সার্থবাহ" থেকে। সংস্কৃতে শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ— যাত্রী দলের চালক, সওদাগর দল অথবা তীর্থযাত্রীর দলকে যিনি তত্ত্বাবধান করে নিয়ে যান, ঠিকমত পথঘাট যাঁর জানা আছে। বাংলায় তদ্ভব শব্দটি বজায় আছে। "সাথী" এসেছে 'সার্থক' থেকে, অর্থ—যাত্রী দলের সঙ্গী!) সুনীতিবাবু যথার্থ সেথো হয়ে আমাকে বিদ্বান ও বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত করিয়েছিলেন। বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে তখন প্রথম ও প্রধান ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। এখনকার দিনের সাহিত্য পরিষদে যাঁদের গতিবিধি আছে তাঁরা সে সময়ের সাহিত্য পরিষদের পরিবেশ অনুভব করতে পারবেন না। এ প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষিত বাঙালী গড়ে তুলছিল ধীরে ধীরে তার মনীষার চিরসঞ্চিত ভাণ্ডারের জাতীয় Safe deposit vault রূপে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালী দেশের ভবিষ্যৎ মনীষাকে উদ্দীপ্ত করবার ভাবনা ভাবত। যাঁর যেখানে কিছু মূল্যবান রিক্‌থ অথবা প্রত্ন সঞ্চয় ছিল—পুঁথিপত্র হোক, ছাপা বই হোক, খোদাই পাথরের টুকরো অথবা ধাতুর দেবমূর্তি হোক কিংবা তামার-রূপোর অথবা সোনার প্রাচীন মুদ্রা হোক—যথাসাধ্য ও যথামতো তা সাহিত্য পরিষদের ভাণ্ডারে গচ্ছিত করতেন, যাতে সেগুলি নষ্ট না হয়ে ভবিষ্যতের বাঙালীর জন্যে সুরক্ষিত হয়ে থাকে। বিলেত থেকে ফিরে এসে সুনীতিবাবু এই সাহিত্য পরিষদের কাজে যোগ দিলেন। তখন সাহিত্য পরিষদের কর্ণধার ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে সুনীতিবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

ঠিক সেই সময়ে আমার গবেষণার বিষয় ছিল ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির ভাষা বিন্যাস। সুনীতিবাবু একদিন আমাকে বললেন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার জন্যে আপনি একটা প্রবন্ধ লিখুন। আমি বললুম,

যা নিয়ে কাজ করছি সে বিষয়ে সাধারণের পাঠযোগ্য ছোটখাটো প্রবন্ধ লিখতে পারি।

তিনি বললেন, তাই লিখুন। আমি সানন্দে প্রবন্ধ লিখলুম—'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার গদ্যের ভঙ্গী।' উৎসাহ করে তাঁকে দেখাতে নিয়ে গেলুম। প্রবন্ধটি পড়লেন, পড়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, এঃ—আপনি দেখছি বাঙলা ভালো লিখতে পারেন না। আমার মনে সে কথা বিঁধলো। বাংলায় আমার সাংঘাতিক রকম দখল আছে এই গূঢ় গর্ব ছিল আমার। আমাদের বছরে ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের পাশে সাংকেতিক অক্ষর দেবার রীতির প্রচলন হয়। আমার নামের শেষে অক্ষরের মধ্যে 'ডি' ছিল। তার মানে আমি বাংলায় আশী অথবা তার বেশী নম্বর পেয়েছিলুম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলায় প্রবন্ধ লেখায় চল্লিশ নম্বর ছিল। আমি সে পরীক্ষায় প্রবন্ধ লিখেছিলুম বাইশ পাতা ধরে। (এখন ভাবি কী বোকামিই যে করেছিলুম!) সুনীতিবাবু বললেন, এ রকম আড়ষ্ট সাধু ভাষা এখনকার দিনে অচল। ম্লান মনে বাড়ী এসে প্রবন্ধটা নতুন করে লিখলুম। দু-তিন দিন পরে গিয়ে সুনীতিবাবুকে পুনর্লিখিত প্রবন্ধ দেখালুম। তিনি বললেন, এবার চলবে। সেই প্রবন্ধ নিয়ে তিনি ছাপিয়ে দিলেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়।

সুনীতিবাবুর মহাগ্রন্থ Origin and Development of the Bengali Language বার হলে পর (১৯২৬) একজন ছাড়া দেশের আর কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি অথবা কোন বিদ্বৎ সমাজ তাঁকে অভিনন্দন জানাননি। যিনি ব্যতিক্রম, তিনি হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি গ্রন্থ প্রকাশের সংবর্ধনরূপে তাঁর পটলডাঙার বাড়ীতে সুনীতি-বাবুকে ও তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গকে একদিন বিকেলে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করেছিলেন। সবশুদ্ধ কুড়িজন নিমন্ত্রিত ছিলেন, তার মধ্যে আমিও ছিলুম। নৈহাটি থেকে অনেক রকম খাবার

আনিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। সে-রকম জলখাবারের ব্যবস্থা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সুনীতিবাবু কবে সেই যে বলেছিলেন, আমি বাংলা ভালো লিখতে পারি না, সে গুরুতর গুরুবাক্য আমি আজও ভুলতে পারিনি। তারপর থেকে আমি ভালো বাংলা লিখতে চেষ্টা করে এসেছি কিন্তু আমি ব্যাকরণিয়া-সাহিত্যিক নই, তাই আজও সংশয় ঘোচে না ভালো বাংলা লিখতে পেরেছি কিনা। না পারলেও ক্ষোভ নেই, সেই চেষ্টাতেই আমার গুরুগৌরব।

—সুকুমার সেন

সুনীতিকুমারকে আমি, প্রথম আবিষ্কার করি বাল্যকালে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায়। যতদূর মনেপড়ে প্রথম পৃষ্ঠায়। বর্ষপঞ্জী বা সেই জাতীয় একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন তিনি। ভূমিকাটি 'প্রবাসী'তেও প্রকাশিত হয়েছিল। সে এক বিরাট প্রবন্ধ। তথ্য-বহুল, যুক্তিপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক। তার আগে আর কোথাও তাঁর আর কোন রচনা পড়িনি। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা। তারপরে তিনি আবার কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বিদেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে তিনি এদেশের একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক হন। কিন্তু যে বিষয়ের অধ্যাপক হন, সে বিষয় আমার অধীতব্য নয়।

একবার শান্তিনিকেতনে গেছি। সেইখানেই তাঁকে প্রথম দেখি। যতদূর মনেপড়ে সেটা বোধহয় জাভা যাত্রার প্রাক্কালে। ফিরে এসে তিনি সুদীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন। কিছুই তাঁর দৃষ্টি বা শ্রুতি এড়ায় না। রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেটা সৃষ্টিধর্মী। আমরা কবির বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হই। আর বিদ্বানের বিবরণ পড়ে জ্ঞান লাভ করি।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ যতদূর মনে পড়ে সর্বপ্রথম ঘটে রাজশাহী জেলার নওগাঁ শহরের পাবলিক লাইব্রেরীর

একটি অনুষ্ঠানে। সুনীতিবাবুকে কলকাতা থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর আমি তো সেই সময় ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। আরও আগে ছিলুম নওগাঁর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট। আমরা দু'জনে মেঝের উপর পাশাপাশি বসেছিলুম। তিনিও ভাষণ দেন, আমিও ভাষণ দিই। তারপর অন্যান্যদের বক্তব্য শুনি। অন্যমনস্কভাবে কখন এক সময় আমাদের দু'জনের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। বাপ রে! সে কী নিরেট মাথা! ব্যথা সহ্য করি।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে অন্তরালে কিঞ্চিৎ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছিল। তিনি আমার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। সেবার কি অন্য কোনবার তিনি বলেছিলেন যে, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীগুলি দুই শতাব্দীর বেশী পুরাতন নয়। মুখার্জি, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি তো বৃটিশ আমলের। পূর্বে কী ছিল, তিনি সেকথাও আমাকে বলেছিলেন। চল্লিশ বছর পরে মনে আসছে না।

আবার কবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় ও কোথায়, তা ভুলে গিয়েছি। শুধু মনে আছে তিনি বলেছিলেন, 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' পড়েন নি? আপনার জন্যে চমৎকার একটি ভোজ অপেক্ষা করছে। হোমারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আরেকবার বলেন, 'কাব্য হিসাবে কোরাণ অতি অপূর্ব। আরবী সাহিত্যের পরম ঐশ্বর্য।' তিনি যে কেবল দেশ-বিদেশের ভাষা চর্চা করতেন তা নয়, সাহিত্য-চর্চাও করতেন। আর ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সমান ঔদার্য ছিল। একবার তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখান দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের বাণী। বিভিন্ন ভাষায় ও লিপিতে। বাড়ীটির নামও 'সুধর্মা।'

শুনেছি কিছুদিনের জন্যে তিনি হিন্দু মহাসভার প্রভাবে উগ্র হিন্দু হয়েছিলেন। সেটা বোধহয় মুসলিম লীগের উপদ্রবের প্রতিক্রিয়া। দেশভাগের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপদ হয়। তিনিও নিরাপদ। আমি তো পরে তাঁর কথাবার্তায় উগ্র হিন্দু

মানসিকতার লক্ষণ লক্ষ্য করিনি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। সুতরাং বিচ্যুতি যদি ঘটে থাকে তবে সেটা সাময়িক। কিছুদিন তিনি হিন্দী নিয়েও মেতেছিলেন। হিন্দীপ্রেমী বলে হিন্দীভাষী মহলে তাঁর যে দীর্ঘ দিনের পরিচয়, সেটিকেও তিনি মূল্যবান মনে করতেন।

শুনেছি ভারতীয় সংবিধানে যে বাংলায় অনুবাদ হয় সেটি নাকি দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রিত হয় ও তার জন্যে দায়ী নাকি সুনীতি-কুমার। এ নিয়ে কখনো তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা হয়নি। তবে একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, বাংলাভাষা দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হবে আমি এর বিরোধী। কারণ তা হলে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিক বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। এসব প্রশ্নে তিনি ও আমি ছিলুম এক পালকের পাখি। তাই আমাদের বনত ভালো। ওপারের মুসলমানদের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি টান যতই তীব্র হয় ওদের প্রতি সুনীতিবাবুর টানও হয় তেমনি তীব্র। তখন ধর্মের ব্যবধান কোথায় মিলিয়ে যায়। ওরা ওঁকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে ঢাকায় নিয়ে যায়। পনেরোদিন ধরে গেস্ট হাউসে থেকে তিনি নাকি একদিন ফরমাস করতেন মোগলাই খানা, একদিন ইউরোপীয় খানা, একদিন চাইনিজ খানা, একদিন বাংলাদেশী খানা।

তাঁর ফিরে আসার কিছুদিন পরে আমাদেরও ডাক পড়ে। সেই গেস্ট হাউসেই উঠি। এক খানসামা বলল, চ্যাটার্জি সাহেবকে যেমন খাইয়েছি আপনাদেরও তেমনি খাওয়াব, যেদিন যেমনটি চান।

সুনীতিবাবুর সব ভোজ্যে সমান অনুরাগও তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। তা না'হলে কি তিনি সব দেশ দেখতে চাইতেন, সুযোগ পেলেই বেড়াতে বেরোতেন? সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে রূপকথার মন্ত্রীপুত্রের মতো তাঁর যাত্রা। তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর গতি। সর্বত্র বিদ্বান বলে তাঁর অভ্যর্থনা। ভারতের সাহিত্য একাডেমির তিনিই সর্বপ্রথম বেসরকারী নির্বাচিত

সভাপতি। ভাষাঘটিত বিরোধে তাঁর রায়ই ছিল অধিকাংশের কাছে মান্য। 'কোংকনী' কি স্বতন্ত্র একটি ভাষা, না মারাঠীর অন্যতম উপভাষা, এই বহুবিতর্কিত প্রশ্নে তাঁর অভিমত ছিল কোংকনীর স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে। এই প্রসঙ্গে আমি তাঁকে টেলিফোন করলে তিনি বলেন, প্রতিবেশী দুটি ভাষার বেলা যে ভুলটা করেছিলেন একশো বছর আগে, বাংলার পক্ষের কয়েকজন সেই ভুলটাই করছেন মারাঠীর পক্ষের পণ্ডিতগণ।

'কোংকনী'কে সাহিত্য একাডেমি স্বতন্ত্র একটি ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। মারাঠীর অস্বতন্ত্র দাবী অগ্রাহ্য হয়েছে। সুনীতি-বাবুর পরিচালনায় সাহিত্য একাডেমির স্বীকৃত ভাষার তালিকা বেশ বেড়ে গেছে। রাজস্থানী, মণিপুরী, ডোগরি এখন আর উপভাষা নয়। যেখানে ভাষার সংখ্যা বাইশে দাঁড়িয়েছে সেখানে সুনীতিবাবুর মতো একজন বহুভাষাবিদের সভাপতিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাঁর অবর্ত-মানে যিনি সভাপতি হবেন তিনি কখনো তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে সমর্থ হবেন না। এ ক্ষতি অপূরণীয়। সেইজন্যে সুনীতিবাবু একটা টার্ম শেষ করার পরও আর একটি টার্ম ভোগ করছিলেন। আরো কয়েক মাস বাকী ছিল। এই বয়সেও তাঁর যাতায়াতে বিরাম ছিল না। তবে বাঙ্গালোরে গত এপ্রিল মাসে যে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাতে তিনি যোগ দেননি। অসুস্থ ছিলেন।

আমার কলকাতার বাসায় একদিন সুনীতিকুমারের পদার্পণ আমাকে চমৎকৃত করে। সঙ্গে রবীউদ্দীন আহমেদ। তাঁরা একটা ইন্দো-ইতালিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। তার নামের জন্যে একটা মনোগ্রাম দরকার। তাঁদের নক্‌সার খসড়াটা তাঁরা আমাকে দেখান ও আমার অভিমত জানতে চান। এসব দিকেও সুনীতি-বাবুর আগ্রহ ছিল। তাঁর বাড়ীতে গেলেও দেখতে বলতেন তাঁর শিল্পসংগ্রহ। শেষের বার দেখা করতে যাই আমার পুত্রকে নিয়ে। তিনি তাঁর লেখা একখানি বই উপহার দেন। বিদায় দেবার

সময় নিয়ে যান সেই ঘরে যে ঘরে ছিল উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি। অনেক অর্থব্যয় করে সেখান থেকে আনিয়েছিলেন। তাকে যত্ন করে রাখার জন্যে একটি পাদপীঠ নির্মাণেও বহু অর্থব্যয় হয়েছিল। মনে হলো সুনীতিবাবু কেবল শিল্পরসিক নন, ধর্মজিজ্ঞাসু। তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার আর একটি দৃষ্টান্ত রবীউদ্দীনের সঙ্গে মিলিত হয়ে দারা শিকোহ্ রামমোহন সমিতি প্রতিষ্ঠা ও সেই উপলক্ষে রবীউদ্দীনের সঙ্গে তারকেশ্বরের ওদিকে এক দুর্গম গ্রামে যাত্রা। পথের বর্ণনা শুনে আমি নিরস্ত হই, কিন্তু পরে যখন আহার্যের বর্ণনা শুনি তখন ধর্মজিজ্ঞাসার চেয়ে রসজিজ্ঞাসা বা রসনাজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রাচীন সংস্কৃতের মতো প্রাচীন গ্রীকেও সুনীতিবাবুর প্রভূত আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন আর্যভাষামাত্রেরই অনুরাগী। আর্যরা একটি জাতিগোষ্ঠী নয়, একটি ভাষাগোষ্ঠী। এটাই বিংশ শতাব্দীর সুধীজনের মত। সুনীতিকুমারেরও। এই ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কাব্য-কীর্তি ইলিয়াড অডিসি তথা রামায়ণ মহাভারত। কিন্তু কাব্য আর ইতিহাস এক জিনিস নয়। যেমন উপন্যাস আর ইতিহাস এক জিনিস নয়। যেমন নাটক আর ইতিহাস এক জিনিস নয়। ইলিয়াডের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যদি সংশয় থাকে তবে রামায়ণের বেলাও সংশয় থাকা বিচিত্র নয়। অকারণ নয়। পরবর্তীকালে রামায়ণকে বৈষ্ণবেরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ ও রামকে তাঁদের উপাস্য অবতারে পরিণত করেছেন। তা বলে পরবর্তীকালের সিদ্ধান্তকে পূর্ববর্তীকালের ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত করা যায় কি? পুরাতত্ত্ব চর্চা করলে গ্রীকের সঙ্গে সংস্কৃতের কেবল ভাষাগত সাদৃশ্য নয়, ভাগবত সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। কাহিনীগুলো ধারণাগুলো তত্ত্বগুলো কে যে কার কাছ থেকে নিয়েছে সেটা এতকাল পরে জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু নেওয়া যেখানে চলে দেওয়াও সেখানে চলে। যেমন বাণিজ্যে। গ্রীকরা যদি ভারতীয়দের কাছ থেকে নিয়ে থাকে তবে ভারতীয়রাও

গ্রীকদের কাছ থেকে নিয়েছে। সুনীতিবাবুর বক্তব্য প্রমাণিত না হলেও অযৌকতিক নয়। এর দরুন তাঁকে শেষ বয়সে সাহসের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। এই সংস্কারমুক্ত পৌরুষের সামনে মাথা আপনি নত হয়।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

অনেকদিন আগে বিখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন, তখন তাঁর বিদায় অভিনন্দন সভায় প্রত্যভিভাষণ দিতে উঠে বললেন, আমার পরে একদা বহু পণ্ডিত শোভিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথার্থ অধ্যাপক বলতে আর একজনই রইলেন—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ কথায় তিনি অপর কাউকে ছোট করতে চান নি, বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক হওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। যতখানি সর্বাঙ্গীন পাণ্ডিত্য থাকলে তবে যথার্থ অধ্যাপক হওয়া যায় তা বোধকরি সুনীতিকুমারের মতো আর কারও ছিল না।

সেই পুরোপুরি গোটা অধ্যাপকটি আজ আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিলেন। মাত্র কিছু দিন আগেই গোপীনাথ কবিরাজ মশাই গেছেন, সুনীতিবাবু গেলেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে আর একজন দিকপাল রইলেন বটে—রমেশচন্দ্র, তবে সে আর কদিন? আমাদের প্রার্থনার যতই জোর থাক—একথাও তো অনস্বীকার্য যে নব্বুইয়ের সংখ্যা ছুঁই ছুঁই করছে তাঁর বয়স।

কিন্তু সুনীতিবাবু কি শুধুই একটা গোটা অধ্যাপক, একটা বিরাট অপরিমাণ পাণ্ডিত্যের আধার ছিলেন? শুধু ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্যে নয়—সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প প্রভৃতি বিদ্যার সকল প্রধান শাখায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি ছিল বলেই তাঁর জন্য আমরা এত বেদনা বোধ করছি? না, তাহলে আমরা দুঃখিত হতুম ঠিকই, জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হল বলে বেদনা বোধ করতুম—

কিন্তু এমন একটা বিপুল শূন্যতা বোধ করতুম না, বুকের মধ্যেটা এতখানি বেদনায় টনটন করে উঠত না, এমন অভিভাবকশূন্যও বোধ হত না নিজেদের।

জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ছাড়াও অনেক কিছু ছিল তাঁর। ছিল রসবোধ, রসিকতা করার ও বোঝার ক্ষমতা, ছিল প্রচুর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, ছিল প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, ছিল একটি নিরহঙ্কার সর্বপাত্রে প্রীতিপূর্ণ বিশাল হৃদয়।

পরবর্তী কালের মানুষ তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় কিছু হয়ত পাবে তাঁর বিভিন্ন রচনায়—যদিও তাঁর বিরাটত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে কিনা সন্দেহ, যতটা ন্যূনতম বিদ্যা থাকলে তা করা সম্ভব তা ক'জনের থাকবে?—কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি কত বড় ছিলেন তার কোন পরিচয়ই পাবে না। এইখানে আমাদের জিত, আমরা তাঁকে দেখেছি, দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গ সাহচর্য পেয়েছি—তাঁর স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছি।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় নিতান্তই এক স্থূল বৈষয়িক ব্যাপারে। তার আগে ওঁর বিস্তর লেখা পড়েছি। ওঁর সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখা পড়েছি, দু'একটা সভা সমিতিতে ওঁর বক্তৃতাও শুনেছি, কিন্তু আলাপ ছিল না, অকারণে ওঁর সময় নষ্ট করতে সাহসও হয় নি।

সহসাই সে সুযোগ এসে গেল। তখন আমি ও আমার বন্ধু সুমথবাবু সরকারী চাকরির ছত্র ছায়ায় নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা নির্বাহের কাম্য সুযোগ ছেড়ে, শুধু সাহিত্যিকদের কাছাকাছি এবং সাহিত্যের মধ্যে থাকতে পারব—এই আশায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় পুস্তক ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। অবশ্য তাঁকে ব্যবসা না বলে ব্যবসার পরিহাস বলাই উচিত বোধহয়—কারণ বিনা পুঁজিতে আর কতটুকু হবে? দুই সহৃদয় প্রকাশক ধারে কিছু বই দিয়েছিলেন, তাই নিয়েই ফিরি করে বিক্রী করি—ইস্কুলে ইস্কুলেই বেশির ভাগ, মফঃস্বলের

লাইব্রেরীতেও। এই হাতে-কলমে কাজ করায়, নিজেরা ঘুরে বই বিক্রী করার ফলে, কিছু কিছু ভুল ধারণার অপনোদন ঘটেছিল। আগে সবাই জানত প্রবন্ধের বই কেউ কেনে না। আমরা দেখলাম ঠিক জায়গায় নিয়ে গেলে বা ঠিকভাবে বিজ্ঞাপিত করলে তাও কেনে।

এই ভাবে বই বিক্রী করতে করতেই সাধ হল নিজেরা কিছু বই প্রকাশ করব। 'সচল' লেখকদের উপন্যাস প্রভৃতি নিতে গেলে অগ্রিম টাকা দিতে হয়, সে টাকা কোথায় পাবো? স্থির করলাম—প্রবন্ধের বই দিয়েই শুরু করব। ভরসাও পেলাম একটু—আমের বাজারে গায়ে পড়ে পরিচয় করেছিলাম সুরেন দাশগুপ্ত মশাইয়ের সঙ্গে. সর্বপ্রথম তাঁর কাছেই গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা কি পাগল? প্রবন্ধের বই কে কিনবে? কিন্তু একটু পীড়াপীড়ি করতেই রাজী হয়ে গেলেন। অতঃপর সুনীতিবাবু। ওঁর উত্তর টিপিক্যাল। বললেন, 'আমি মশাই খরচ পত্তর দিতে পারব না।' আমরাও অবাক, বললাম, 'আপনি দেবেন কেন, আমরাই খরচ করে ছাপাব, বরং আপনি কিছু পাবেন—খরচপত্র উঠে গেলে।' কথাটা বোধহয় তত বিশ্বাস হল না, হয়ত পাগলই ভাবলেন। তবু রাজীও হয়ে গেলেন—তারই ফল, 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।'

কিন্তু যতদিন যেতে লাগল বুঝলাম 'এই বাহ্য', সাধারণ মানুষের কোন মাপেই ওঁকে মাপা যায় না। প্রথম ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হল—নওগাঁ (রাজশাহী) সাহিত্য সভায়। ওখানকার এক উকীল, রায় মশাই—ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে আমাকেই বলেছিলেন কিছু সাহিত্যিক জোগাড় করে দিতে। অনেকেই রাজী হয়ে গেলেন, সুনীতিবাবু, দিলীপকুমার রায়, প্রবোধ সান্যাল—আরও অনেকে। রীতিমতো গ্যালাকসি যাকে বলে। 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'—আমরাও দুই বন্ধু গিয়েছিলাম। তখন অন্নদাশঙ্কর রাজশাহীর জেলা হাকিম, তার ফলে সাহিত্য সভার আয়োজনে

কোন অসুবিধা ঘটে নি। বলিহার রাজ বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল, আতিথ্যের আয়োজনও ত্রুটিহীন। তবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিলনা তখন। পাখার সুখ পাই নি।

প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই ছিল সুনীতিবাবুর বক্তৃতার ব্যবস্থা, বিষয় বৃহত্তর ভারত। যে হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল তা বেশ বড় হলেও, শ্রোতার সংখ্যা প্রায় দু' হাজারে পৌঁছেছিল। ঘরে ও তার চারদিকে বাইরে নিশ্ছিদ্র জনতা। সেটা যতদূর মনে হচ্ছে আষাঢ় মাস, অসহ্য গুমোট। অতগুলি লোকের নিঃশ্বাস, হ্যাজাগের আলোর তাপ, হাওয়া তো নেইই—থাকলেও তার প্রবেশের কোন পথ ছিল না। অসহ্য অবস্থা। কিন্তু সুনীতিবাবুর বাগ্মীতার এমন জাদু, অসংখ্য বিস্ময়কর তথ্য পরিবেশনের এমন আশ্চর্য দক্ষতা অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি ও মেধার এমনই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, গুরুগম্ভীর বিষয়কে রসিকতার প্রলেপে স্বচ্ছ করার এমন অনন্য সমতা যে, সে দুঃসহ দৈহিক ক্লেশ তুচ্ছ করে সেই বিপুল জনসমাবেশ স্থির হয়ে দু'ঘণ্টারও বেশী ওঁর বক্তৃতা শুনল। শ্রোতার সংখ্যা বেড়েই চলল একজনও বেরিয়ে এল না।

ফলে আমরা যখন সভার শেষে বাসায় এলাম তখন আমাদের কাপড়জামা ঘামে ভিজে তা দিয়ে জল ঝরছে। ফিরে এসে একটু সহজ হবো তার জো নেই। সভা ভঙ্গে প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন অনুরাগী ও উদ্যোক্তা সঙ্গে এলেন। আলাপ করতে চান সকলেই। আমরা তখন জামাটামা ছেড়ে একটু সুস্থ হতে পারলে বাঁচি কিন্তু এতগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে সেভাবে বসা কি সম্ভব? আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন সুনীতিবাবুই, তিনি জামা গেঞ্জি ছেড়ে খালিগায়ে একটা হাত পাখার বাট দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে এসে বসলেন, দু দিকের ধুতিও একটু কোমরে গুঁজে পায়ের অনেকখানি অনাবৃত করে। আমরা বেঁচে গেলাম—এবং বলা বাহুল্য অচিরে ওঁর পন্থা অনুকরণ করলাম।

সুনীতিবাবুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার একটা বিচিত্র সূত্র জুটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পর। উনি গাড়ি বিক্রী করে ট্রামে বা বাস-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করলেন। আমি তো আগে থেকেই তাই যাচ্ছি—দৈব অনুকূল বলেই বোধহয় এমন যোগাযোগ। আমি যেদিন যাতে উঠতাম, উনিও প্রায়ই সেই গাড়িতে উঠতেন, অন্তত সপ্তাহে তিন দিন। এই স্বল্পক্ষণের সান্নিধ্য, এ আমার জীবনের এক পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। সারা পথই কত কি যে তথ্য জানাতে জানাতে যেতেন তার সীমাসংখ্যা নেই। আমার মূর্খতা এই সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করিনি। এত যে জানতেন তাও যেমন বিস্ময়কর, সে জ্ঞান অপরকে পরিবেশন করতে যে ক্লান্তিহীন আগ্রহ সেও তেমনি। অবশ্য শুধু যদি জানবার কাজটাই এক্ষেত্রে প্রধান হত তাহলে আমাদের আগ্রহ বোধ করি এতটা প্রবল হত না। জাদু ছিল তাঁর বলার ভঙ্গীতে। একটা প্রসঙ্গ থেকে আর একটা প্রসঙ্গে অনায়াসে গতিবিধি এবং তাঁর সঙ্গে অসংখ্য স্মৃতিকাহিনী এবং সেগুলির অধিকাংশই কৌতুকপ্রদ, সরস এবং অভিনব। ইংরেজী ফরাসী মার্কিন নানান জাতির নানান ভাষায় প্রচলিত রসিকতা, সেই সঙ্গে একেবারে বাঙালীর ঘরোয়া পৃষ্ঠপটে নিজস্ব ইডিয়মের অবিস্মরণীয় ঠাট্টাতামাশার পুনরাবৃত্তি চলত, যার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয় এবং যা আদি রস-ঘেঁষা হতেও কোন অসুবিধা বা আপত্তি নেই।

এইখানেই সুনীতিবাবু অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ, সহজ, অকৃত্রিম মানুষ ও বিশুদ্ধ বাঙালী। তাঁর ভোজনপ্রিয়তা প্রবাদে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তা কোনকালেই রাক্ষুসে খাওয়া ছিল না। আহার সম্বন্ধে ঔদার্যটাই ছিল সব চেয়ে লক্ষ্যণীয়। 'মানব জীবন রসে যত আছে স্বাদ'—সবটাই তিনি আস্বাদ করতে চাইতেন। 'মশাই কোচিনে গিয়ে রসগোল্লা আর চচ্চড়ি খেতে চায় যারা তাদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। রসগোল্লা তো জীবনভরই খেলে, ওখানের বিখ্যাত খাবারগুলো খেয়ে ছাখোনা।'

একসময় আমাদের প্রকাশনার কাউনটারে মাঝে মাঝেই আসতেন, সপ্তাহে একদিন দুদিন তো বটেই। কখনও আরও ঘন-ঘন। কোন শৌখীন খাবার আনাতে চাইলে ধমক দিতেন, ভীষণ খুশী হতেন মুড়ি নারকেল আনালে। উনি ও কালিদাসবাবু এলেই ও দুটি জিনিস আনানো হত। সুনীতিবাবুই ওটার নাম দিয়েছিলেন মুড়ি ক্লাব। অর্থাৎ পৃথিবীর সব সুস্বাদু খাবারে সমান আসক্তি থাকলেও দেশী খাওয়াটাই পছন্দ করতেন বেশী। মাত্র বছর তিনেক আগে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন। তিলকুটো পাওয়া যায় এখনও? ওটার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে রীতিমতে নট্যালজিয়া ফীল করি।'

আমি যোগাড়করে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিয়েছিলুম। খুব খুশী হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে এও বলেছিলেন, হলে কি হবে—বৌমা বেশী খেতে দেবে না। ওঁর কেবলই ভয়, আমার শরীর খারাপ হবে।'

জীবনের সমস্ত দিকের সমস্ত রস সম্বন্ধেই ওঁর সমান ঔৎসুক্য ছিল। ঐ যে রবীন্দ্রনাথের ক'টি লাইন—যেন ওঁরই মনোভারের বর্ণনা :

"মানব জীবন রসে যত আছে স্বাদ। ইচ্ছা হয় বার বার মিটাইয়া সাধ, পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে। আনন্দ মদিরা ধারা নবনব স্রোতে।" গানবাজনা? অভিনয়, সাহিত্যচর্চা, চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য শিল্পকলা সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অপরিমাণ জ্ঞান ছিল ; সমস্ত চারুকলা সম্বন্ধেই ছিল অপরিসীম ঔৎসুক্য। ইতিহাস সম্বন্ধেও দখল ও আগ্রহের অবধি ছিল না। একদিন ভূগোলের প্রসঙ্গ উঠতে উনি যেসব কথা বললেন তাতে মনে হল চিরকাল ঐ বিষয়েই পড়াশুনো করে এসেছেন। আমি বলে নয় বা অন্য আত্মীয় কি বন্ধু কিম্বা ছাত্র বলে নয়—যখনই যে গেছে দেখেছি তাকেই কিছু না কিছু নতুন কথা শোনাচ্ছেন, নতুন তথ্য জানাচ্ছেন। জানতেন যে কত - তার পরিমাণ কেউ কোনদিন বোধহয় কল্পনাও করতে পারেন নি। ১৯৩০-এ রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময়, সংবাদপত্র মারফৎ, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়

ওঁর যে সব অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার এক এক কপি নমুনা প্রার্থনা করা হয় প্রদর্শনীতে সাজাবার জন্য। পৃথিবীর প্রায় তাবৎ দেশ থেকেই বই এসেছিল, বেশির ভাগই ডাকে। যে ভদ্রলোকের ওপর সে সব প্যাকেট নেওয়ার ভার ছিল, তিনি অতটা ভবিষ্যৎ ভাবেননি। প্যাকেট খুলে মোড়কের কাগজগুলো ফেলে দিয়ে বই-গুলো শুধু একদিকে টাল দিয়ে রেখেছিলেন। বিপদ বাধল প্রদর্শনীতে সেগুলো ঠিকমতো সাজাতে গিয়ে। কোন্‌টা কোন্ ভাষায় অনূদিত, কোন্ কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ, তা বাংলা ও ইংরেজীতে লিখে দেওয়া দরকার। কিন্তু কে বুঝবে কোন্‌টা কোন্ ভাষা? ইংরেজী ফরাসী জার্মান রাশ্যান এগুলো সহজ—অনেকেই জানেন। চীনে ও জাপানী হরফের তফাৎটাও কেউ কেউ বোঝেন হয়ত, তারপর? অগত্যা ডাকতে হল সুনীতিবাবুকে। দুটো কি একটা ছাড়া প্রায় সবগুলোই তিনি চিহ্নিত করে দিতে পারলেন। শুনেছি স্বাধীন কঙ্গো রাজ্য থেকে গীতাঞ্জলির অনুবাদ এসেছিল। সেটা বহুদিন পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেন নি।

সুনীতিবাবুকে ভাষাবিদ বা ভাষাতত্ত্ব বিশারদ বললে অস্পষ্ট একটা ধারণামাত্র হয়। সুনীতিবাবুর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি ল্যাটাভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব এবং ঋণ দেখিয়ে সারা বিশ্বের বিদ্বজ্জনের বিস্ময়াভিভূত শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন যিনি মেকসিকোর চিত্রকলার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিত্র-কলার যোগাযোগ প্রমাণ করেছিলেন, তাঁকে অত সহজে অত সংক্ষিপ্ত বিশেষণে পরিচিত করা যায় না।

অথচ এই লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী মানুষটির বিন্দুমাত্র অভিমান কি অহঙ্কার ছিল, নিজের অবিশ্বাস্য অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে এতটুকু সচেতনতা ছিল, এমন অপবাদ অতিবড় শত্রুতেও দিতে পারবে না। তিনি শুধু যে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকা অপছন্দ করতেন তাই নয়, সকলের সঙ্গে, সকলের মধ্যে থাকতেই

ভালবাসতেন। কখনোই বোধহয় নিজেকে বড় বলে, উচ্চস্তরের মানুষ বলে ভাবতে পারেননি। এতখানি অনন্য সাধারণ ঔদার্য ও মানবপ্রীতি আর কোনও গুণীজ্ঞানীর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যখন সম্মান ও সচ্ছলতার শীর্ষে পৌঁচেছেন, তখনও বাল্যকালের নিম্নবিত্ত অবস্থার কথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না।

সুনীতিকুমার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একজন বলে স্বীকৃত ও চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও মনেপ্রাণে পুরোপুরি ভারতীয়, বিশেষ করে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বাঙালীর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাঁই সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিলেন, এর প্রমাণ বার বার পেয়েছি। কোন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে কেউ নিমন্ত্রণ করলে তা নিমন্ত্রণকারী যত সামান্য বা নগণ্য ব্যক্তিই হোন না কেন, কদাচ উপেক্ষা বা অবহেলা বলে শুনি নি। এই পরিণত বয়সেও দেখেছি, এখানে উপস্থিত থাকলে অবশ্যই, একবার যেতেন এবং সম্ভবমত কিছু আহার্যও গ্রহণ করতেন। আয়োজনের দৈন্য কখনও আপ্যায়নের বাধা হয়ে দাঁড়াত না।

খাঁটি বাঙালী ছিলেন তিনি চালে চলনে, আহারে বিহারে, পোশাকে পরিচ্ছদে। এমন কি মেজাজেও। বাঙালীর যে নিজস্ব মজলিশী স্বভাবটি আজ ইতিহাসের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে—সে বস্তুটির কিছু পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর কথাবার্তায়, খোস গল্পে। তিনিই আমার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র মানুষ ( কিছুটা বীরেন ভদ্রও ), যাঁর সঙ্গে একা বদ্ধ ঘরে দশ দিন কাটালেও ক্লান্তি বা বিরক্তি আসত না।

সুনীতিকুমারের জগৎ ছিল বিরাট, বহু ব্যক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গেই যোগাযোগ। সে জগতের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ ছিল না, তাঁর জগতের বা মানস-স্তরের বহু নিচের মানুষ আমরা -তবু তাঁর যে ভালবাসা পেয়েছি, অহেতুক করুণা বলাই হয়ত উচিত, তা চিরদিন সবিস্ময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব। ক্রিয়াকলাপে তো বটেই, কোন কোন অতি অন্তরঙ্গ প্রীতি সম্মেলনেও

তাঁর আমন্ত্রণ পেয়েছি আর সে আমন্ত্রণের ভাষাও ছিল তাঁরই চরিত্রানুগ। 'অমুক দিন একটু আসুন না, এক সঙ্গে একটু খাওয়া যাক।'

তাঁর কথা লিখতে গেলে মহাভারতের মতো এক গ্রন্থ হয়ে যাবে। সে স্থান, সে শক্তি ও সে অধিকারও আমার নেই। কেবল তিনি কত সহজ ও সরল মানুষ ছিলেন, আমাদের জীবনের কত কাছের মানুষ তারই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আজকের এ স্মৃতিচারণ শেষ করব।

সেটা বোধ হয় ১৯৪১ সালের শেষ—বোমা পড়ার বছর। আমরা ডিহিরীর কাছে বান্‌জারি ( রোটাসগড়ের আগের ষ্টেশন ) বলে এক সিমেণ্টের পাহাড় ঘেরা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি—আমি, সুমথবাবু, প্রবোধবাবু, গৌরীশংকর প্রভৃতি। রাত্রের ট্রেনে চেপেছি, পেষাপিষি ভীড়, তখন তৃতীয় শ্রেণীতে স্লীপার কি সীট রিজার্ভ করার ব্যবস্থা ছিল না। প্রবোধবাবুর অমানুষিক চেষ্টায় কোনমতে একটি ছোট কামরায় বসার আসন পেয়েছি। কিন্তু ঘুম হয়নি, বলা বাহুল্য। ডিহিরীতে নেমে তাই একটু হাত পা ছাড়িয়ে নিচ্ছি, দেখি আর একটি ইন্টার ক্লাসের কামরা থেকে হাফপ্যাণ্ট ( !! ) পরা সুনীতিবাবু জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামছেন, হাতে একটি প্যাঁচওলা ঢাকনা দেওয়া জলের ঘটি।

আমরা তো স্তম্ভিত!

'আপনি! এভাবে!' অতি কষ্টে বোধ হয় এই প্রশ্ন দুটিই উচ্চারিত হল।

'বরোদায় ( না ইন্দোরে—ঠিক মনে নেই ) একটা বক্তৃতা দেবার নেমন্তন্ন আছে। তাতেই একটু কষ্ট করতে হচ্ছে—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেকেণ্ড ক্লাসে গেলেন না কেন?'

সুনীতিবাবু বললেন, 'এভাবে যেতে আমার বেশ লাগে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়, অনেক রকম মানুষ দেখতে পাই। কোন অসুবিধা হয়না।' একই সঙ্গে বরোদায় কী কী দেখার জিনিস

আছে, তার ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে একান্ত অবলীলায় বলে নিয়ে আবার জানালা দিয়ে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লেন।

- গজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৮৯০ সালের ২৬ নভেম্বর (১১ অগ্রহায়ণ, ১২৯৭) হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুরে সুনীতিকুমারের জন্ম। ঐ দিনটি ছিল রাস পূর্ণিমার দিন, ওটি শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের জন্মতিথি। সুনীতিকুমারের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নাকি চন্দ্রগ্রহণ লেগে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিন, সেদিনও ছিল চন্দ্রগ্রহণ। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হন বৈশাখী পূর্ণিমার দিন।

মধ্যবিত্ত সংসারে তাঁর জন্ম। তাঁর ঠাকুরদা ও বাবা ছিলেন কেরাণি। কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটে তখন তাঁরা বাস করেন। সেখান থেকে কলুটোলার কাছে মতি শীলের ফ্রীস্কুলে পড়তে যেতেন সুনীতিকুমার। রাস্তা বেশ লম্বা। খাটো জামা গায়ে খালি পায়ে এই পথ তাঁকে হেঁটে যেতে হত।

তাঁর পিতামহের কাছে সুনীতিকুমার দু-চারটে ফারসি বয়েৎ শুনেছেন, তা তিনি কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। তাঁর বয়স যখন আনুমানিক ষোলো সেই সময়ে তাঁর পিতামহ গত হন। সুনীতি-কুমারের উপর তাঁর পিতার প্রভাবও কম নয়। এঁদেরই প্রভাবে ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে।

তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। তারপর ভরতি হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পাশ করেন ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস-ইতিহাসে অধিকার করেন শীর্ষস্থান। ১৯১১ সালে ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি-এ পাশ করেন, এবং ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ইংরেজিতে এম-এ পাশ

করেন। এম-এ তে তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল প্রাচীন আর মধ্যযুগের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং জারমানিক ও ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব।

ইংরেজির ছাত্র সুনীতিকুমার ১৯১৮ সালে সংস্কৃতের মধ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও জুবিলি গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন।

বিদ্যানিকেতনের শিক্ষা এইখানে শেষ হল বটে, কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তাঁর প্রবলতর হয়ে উঠল।

কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর নিরুত্তাপ ও নিস্তেজ অধ্যাপক হয়েই তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের ধারা ও গতি লক্ষ্য করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এম-এ পাস করার পরই তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। তাঁর পরের বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টে ইংরেজির অধ্যাপক হন। এইখানে অধ্যাপনার সময়েই তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণা যুগপৎ চলতে থাকে। এবং এরই ফলে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও জুবিলি গবেষণা বৃত্তি পান।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়নের জন্যে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে ১৯১৯ সালে তিনি ইউরোপে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করে জেনেটিক্সে ডিপ্লোমা পান, এবং ১৯১৯ সালের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধি পান—তাঁর এই ডকটরেটের থিসিসের বিষয় ছিল ইণ্ডো-আর্বিয়ান ফিললজি।

লণ্ডনে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের কাছে ফোনেটিকস, ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান লিঙ্গুইসটিকস, প্রাকৃত, ফারসি সাহিত্য, পুরাতন আইরিশ পুরাতন ইংলিশ, গোথিক ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ করে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার ভারি করে তোলেন।

তারপর আসেন প্যারিসে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে

এখানে যোগ দেন। এখানে তিনি বিভিন্ন অধ্যাপকের অধীনে পাঠ ও গবেষণা করেন। তিনি এখানে যেসব বিষয় পাঠ করেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—স্লাভ ও ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সগডিয়ান ও প্রাচীন খোতানী ভাষা. গ্রাক ও ল্যাটিন ভাষার ইতিহাস এবং অসট্রো-এশিয়াটিক ভাষাতত্ত্ব।

১৯২২ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা' অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে তিনি অধ্যাপক তারাপুরওয়ালার কাছে আবেস্তা অধ্যয়ন করেন।

এর কয়েক বছর পরে সুনীতিকুমারের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, দুই খণ্ডে ১৩০০ পাতার বৃহৎ গ্রন্থ 'দি অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ।' যে বই এখন সংক্ষিপ্ত নামেই বেশি পরিচিত, যাকে বলা হয় 'ও-ডি-বি-এল'। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুনীতি কুমারের নাম স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়া আরম্ভ হল জ্ঞানী-গুণী সমাজে।

এরপরে সুনীতিকুমারের আরও কয়েকটি বই বের হয় লণ্ডন থেকে, সেগুলি হচ্ছে বেঙ্গলী সেলফ টট, এ বেঙ্গলী ফোনেটিক রীডার, ইণ্ডো-আরিয়ান অ্যাণ্ড হিন্দী কিরাত-জন-কৃতি, আসাম অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এসব বই ইংরেজিতে লেখা।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি ও শ্যামদেশ পরিভ্রমণে যান, সুনীতিকুমার তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিন মাস কাল তিনি দ্বীপবেষ্টিত ভারতের এইসব দ্বীপাবলীর দেশ ঘুরে বেড়ালেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলেন সুনীতিকুমার, সেই ভ্রমণকাহিনী হল তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থটি 'দ্বীপময় ভারত'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল নিবিড়, তাঁর পাণ্ডিত্যের

শ্রদ্ধা ছিল রবীন্দ্রনাথের। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে।

শেষের কবিতায় নায়ক অমিত রায় গেছে শিলং পাহাড়ে। যেখানে সে সময় কাটায় পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বসে বই পড়ে। সাধারণে যা করে অমিত তা করে না। তাই ছুটিতে গল্পের বই না পড়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।'

তাঁর একনিষ্ঠতার জন্য এইভাবে তিনি সম্মান শ্রদ্ধা ও খ্যাতি অর্জন করেন সকলের।

তিনি প্রথম ইউরোপ সফর সেরে ফেরেন ১৯২২ সালে। পুনরায় তিনি ইউরোপে যান ১৯৩৫ সালে। এবার তিনি লণ্ডনের ইণ্টার-ন্যাশনাল কনফারেন্স অব ফোনেটিক সায়েন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যান। ১৯৩৮ সালে পুনরায় যান ইউরোপে। ঘেণ্ট-এ অনুষ্ঠিত ইণ্টার ন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফোনেটিক সায়েন্সের তৃতীয় অধিবেশনে, কোপেনহেগেনে ইণ্টার-ন্যাশনাল কংগ্রেস অব অ্যানথ্রপলজিষ্টস এবং ব্রুসেলস-এ ইণ্টার-ন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিষ্টস—এই তিনটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। এবারও তিনি যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রূপে। ফেরার পথে তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, জার্মাণী, বেলজিয়াম ও ইটালী ঘুরে আসেন।

১৯৩৯ সালে তিনি ওয়ার-স'র ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউট অব পোল্যাণ্ডের অনারারি মেম্বার নির্বাচিত হন।

বিদেশে এইভাবে সম্মানিত হয়ে চলেছেন, ঠিক তখনই তাঁর স্বদেশও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উদ্যোগী হয়। ১৯৩৯ সালে সুনীতিকুমার নিখিলবঙ্গ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কুমিল্লা অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে—গুজরাটে আমেদাবাদে আসামে—বক্তৃতাদানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হতে থাকেন ঐ সময়েই।

এসব ঘটনা ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগের। ভারত স্বাধীন হবার পর, ১৯৪৮ সালে, পুনরায় তিনি ইউরোপে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি রূপে প্যারিস, ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব লিঙ্গুইষ্টস ও ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্টস এবং ব্রুসেলস-এ ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব অ্যানথ্রপলজিষ্টস-এ যোগদানের জন্য। ফেরার পথে মিশরের কায়রোয় কিছুকাল অতিবাহিত করেন।

দেশে ফিরে তিনি নূতন এক উপাধিতে ভূষিত হন 'সাহিত্য-বাচস্পতি'। এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে এই উপাধি দেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভাষাচার্য আখ্যা দেন তাঁর 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে।

অনেক দেশ দেখেছেন সুনীতিকুমার এবং দেখেছেন অনেক মানুষ।

পাটনা, ঢাকা, কটক, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লি, লাহোর বোম্বাই, পুনা, নাগপুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তা ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও বিশ্বভারতীর গভর্ণিং বডির সদস্যরূপে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

পুনরায় বিদেশে যান তিনি। ১৯৫২ সালে মেকসিকো যান রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তিতে। ১৯৫৪ সালে যান পশ্চিম আফ্রিকা সফরে। ১৯৫৫ সালে অসলোর নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস তাঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচিত করেন।

১৯৫৫ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন, তার কয়েক বছর পরে করেন 'পদ্মবিভূষণ'। এই বছরই তিনি চীন সফরে যান।

১৯৫৬-৫৭ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃত কমিশনের চেয়ারম্যান হন।

১৯৫৬ সালে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক হন। ১৯৬৯ সালে হন সাহিত্য অ্যাকাদামীর সভাপতি এবং ১৯৭১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান বস্তুত সারা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে বিপুল বৈদগ্ধে অভিমণ্ডিত এক মহাগুরুর তিরোধান। যদিও তিনি পরিণত বয়সের একটি করুণ মুহূর্তে ইহজীবনের বন্ধন ক্ষয় করে চলে গিয়েছেন, তবু দেশবাসীর প্রাণে তাঁর চিরপ্রয়াণের ঘটনা আকস্মিক আঘাতের মতো বেজেছে। কারণ, এই সেদিনও দেখা গিয়েছে যে, জাতীয় জীবনের বহুবিধ জিজ্ঞাসার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রজ্ঞাশীল বিচারের বাণী উচ্চারিত করছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও মনস্বিতার প্রথম বৃহৎ কীর্তি হয়ে দেখা দিয়েছিল যে গ্রন্থটি, তাঁরই রচিত বাংলা ভাষার উদ্ভব ও উন্নতির যে ইতিহাস, সেই গ্রন্থ সারা ভারতের সাংস্কৃতিক মনস্বিতার সর্বত্র বিরাট এক কৃতিত্বের অবদান বলে সম্মানিত হয়েছিল। শিক্ষিত সাংস্কৃতিক ভারতীয়ের কাছে যে 'ও-ডি-বি-এল' আজ বহুপ্রচলিত ও সমাদৃত একটি প্রিয় নামে পরিণত হয়েছে, সেটি আচার্য সুনীতিকুমারের রচিত সেই প্রথম কীর্তিকারী গ্রন্থ, ওরিজিন অ্যাণ্ড ডেভলপমেণ্ট অব বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ। বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ক এই গ্রন্থটি ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণা এবং অনুশীলনের পক্ষে নূতন প্রেরণার এবং বিচারের সর্বতোভদ্র একটি আদর্শিক রীতির প্রথম-সার্থক নিদর্শন।

বহুভাষাবিদ শ্রীহরিনাথ দের মৃত্যুতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'যাচ্ছে পুড়ে নতুন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।' কবির উক্তিটি হরিনাথ দের বহুভাষাজ্ঞানের প্রতি প্রশস্ত শ্রদ্ধার ভাষণ। বলা বাহুল্য, কবির এই উক্তি ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের

বৈদগ্ধ ও মনস্বিতার সম্পর্কে আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ বহুভাষা-জ্ঞানের অতিরিক্ত যে জ্ঞানের অধিকারে তাঁর প্রতিভা ভাস্বরিত হয়েছিল, সেটা হলো বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব ও ইতিবৃত্ত সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় বিশেষজ্ঞতা। কোন সন্দেহ নেই, আচার্য স্বনীতিকুমারের তিরোধান বর্তমান ভারতের মনস্বিতার আকাশ থেকে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির অন্তর্ধান বলে দেশবাসীর মনে ও প্রাণে অনুভূত হবে।

আচার্য স্বনীতিকুমারের সন্ধিৎসা শুধু যে ভাষাতত্ত্বের চতুঃসীমার মধ্যে আশ্রিত ছিল না, সে-সত্যও দেশবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। কারণ সাংস্কৃতিক জীবনের বহু বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং অধ্যয়নের বিরাট এক অবদান তাঁর চিন্তার সাহিত্যরূপে দেশবাসীর পক্ষে দেখবার ও পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। রম্যকলা সম্বন্ধে তাঁকে বর্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা চলে। সাহিত্যের বিবিধ প্রকর্ষের ক্ষেত্রেও তাঁর জ্ঞান-ধারণার গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে হয়। তিনি জাতির সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের ও প্রতিষ্ঠানের বহু ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অধ্যক্ষতা ও পরিচালনার পদগৌরব লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার একটি বিস্ময়কর সমগ্রগ্রাহিতার সত্য এই যে, তিনি রাজনীতিক দায়িত্বের নেতৃত্বাধিকারও লাভ করতে পেরেছিলেন; তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। প্রচলিত কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠান-বিধির যে সংস্কার তিনি চেয়েছিলেন, সেটা ছিল তাঁর সামাজিক মমতাবোধের দাবি, নিতান্ত পাণ্ডিত্যের দাবী নয়। সমাজবিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের বিপুল তথ্য তাঁর অধিগত ছিল। তিনি ছিলেন সমাজপ্রেমিক এবং বৃহত্তর অর্থে জাতিরই মাঙ্গলিক পরিণামের আহ্বায়ক এক দেশপ্রেমিক। যাঁরা তাঁর সদাচারিতার অনেক খবর রাখেন, তাঁরা জানেন যে, বিরাট মনস্বিতা ও সারস্বত ঐশ্বর্যের এই মানুষটি মানবীয় মমতার ও

সামাজিক সম্মানের রক্ষায় কী উদার আগ্রহে তাঁর অভীপ্সিত কর্তব্য পালন করতেন। একটি দৃষ্টান্ত, নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় অপহৃতা বলাৎকৃতা ও ধর্মান্তরিতা এক কুমারী মেয়ে উদ্ধার লাভ করে কলকাতায় আনীত হবার পর তিনি সাগ্রহে সেই মেয়ের বিবাহে পৌরোহিত্য করেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর সামাজিক কল্যাণাদর্শের একটি মহান্ উদারতার পরিচয়। বলতে হয়, এক্ষেত্রে তাঁর চারিত্র্যে যেন ছান্দোগ্য উপনিষদের সেই গৌতম ঋষিরই অনুরূপ হৃদয়বত্তা ও বিচার-বিবেকের সৌন্দর্য নতুন করে বিকশিত হয়েছিল। ভর্তৃহীনা জবালার ছেলেকে ঋষি গৌতম যেমন সত্যকুলজাত বলে মর্যাদা প্রদান করে মহোত্তম সামাজিক উদারতার বিধি নির্দেশিত করেছিলেন, আমাদের আচার্য সুনীতিকুমারও নিগৃহীতা একটি মেয়েকে সামাজিক গ্লানির আঘাত হতে রক্ষা করে তাকে শুদ্ধ প্রমুক্ত ও পবিত্র জীবনের অধিকার দেবার শুভানুষ্ঠানের পুরোহিত হয়েছিলেন। ঘটনাটি সমাজবৎসল সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পরিচয়।

জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার সম্পর্কে জাতির প্রাণের এই অভ্যর্থনা চিরকাল জাগ্রত থাকবে যে, তিনি জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর বৈদগ্ধ পরিসেবিত করে অবিস্মরণীয় কীর্তির মানুষ হিসাবে জাতির সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় গৌরবোজ্জ্বল নামাঙ্কন সম্ভব করেই চলে গিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের পাণিনির প্রতিভা এবং আধুনিক ইওরোপের শ্রেষ্ঠ গুরু-গবেষক আচার্যদের নিগূঢ় অন্তর্দর্শী বিচার ও তথ্য সমাহারের প্রতিভা আমাদের এই ভারতীয় মনস্বী আচার্য সুনীতিকুমারের প্রতিভাতে একত্রিত ও সমন্বিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁর তিরোধানে দেশবাসীর প্রাণ ব্যথিত হয়েও এই সৌভাগ্যের সত্যতা উপলব্ধি করবেন যে, আচার্য সুনীতি-কুমার ভারতীয় পাণ্ডিত্যেরই এক নূতন ঐতিহ্যের প্রবর্তক।

—সাগরময় ঘোষ

পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ভাষাচার্য উপাধি প্রদান করেছিলেন। কবি তাঁর জীবন-সায়াহ্নে, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'বাংলাভাষা-পরিচয়' শীর্ষক গ্রন্থখানি ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে উৎসর্গ করেন।

১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই খণ্ডে The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সুনীতিকুমারের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ।

এরই পরের বৎসর ১৯২৭-এ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে গুরুদেবের সঙ্গে সুনীতিবাবু জাভা-যাত্রী হলেন। সেই ভ্রমণের বিবরণ আছে কবির জাভা-যাত্রীর পত্র গ্রন্থে। অপর দিকে সুনীতিবাবু এই ভ্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন দ্বীপময় ভারত শীর্ষক গ্রন্থে।

জাভা-যাত্রীর পত্রে রবীন্দ্রনাথ সুনীতিবাবুর রচনা প্রসঙ্গে যে কথাগুলি লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করি—

'সকলপ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, এ কথা বলা চলে যে শব্দ-

তত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম; বর্ণনা সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত—'লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপিসার্বভৌম কিংবা লিপি চক্রবর্তী।'

১৩৩৪-এর চৈত্র মাস। সে-সময় কলকাতায় সাহিত্যের রস-আদর্শ, রুচি, শ্লীল-অশ্লীলের মানদণ্ড নিয়ে সাহিত্যসেবীদের মধ্যে রীতিমত মতান্তর ও মনান্তর চলছিল। কবি কলকাতায় এলে তাঁকে এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কবির সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে সভা বসে ৪ঠা এবং ৭ই চৈত্র। এই সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দেন সুনীতিকুমার, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অমল হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস।

এই সভায় সুনীতিবাবু কবিকে বলেছিলেন, 'সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।' এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা সাহিত্যের পথে গ্রন্থের অন্তর্গত সাহিত্য সমালোচনা নিবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে।

সুনীতি চাটুজ্যে যেসব জ্ঞান-গম্ভীর গ্রন্থাদি লেখেন তা বোধ হয় সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই শেষের কবিতার অমিত রায়ের কথা মনে পড়ে। গল্পে সেও সাধারণ মানুষ নয়, বরং অসাধারণ। তার সম্পর্কে কবির বর্ণনা—

'কিছুদিন ওর কাটলো পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই

পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগলো সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও সুনীতিবাবুর O. D. B. L. গ্রন্থটি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন।

১৩৩৬-এর ভাদ্রে শেষের কবিতা বেরলো, আর ওই বছরেরই ২৫ মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কবি পড়লেন শব্দ-চয়ন শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের যথোপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে তার তালিকা। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।'

১৩৩৮ অগ্রহায়ণে বিচিত্রায় ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন যে-প্রবন্ধ লেখেন, তারই উত্তর দিতে গিয়ে ওই পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বাংলার বিখ্যাত 'ধ্বনিতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমারের বিধান' উপস্থিত করেন।

১৯৩২ সালে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিশেষ অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। সুনীতিবাবুও সে-সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। কিন্তু যে-মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ হলেন অধ্যাপক, সেই মুহূর্তে অপর সকলে অধ্যাপকের উচ্চ মঞ্চ থেকে ছাত্রদের আসনে এসে বসে গেলেন।

সেদিনের বাংলা বিভাগের ছাত্র শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—

তখন আশুতোষ বিল্ডিং-এর ১৮সি সংখ্যক ঘরে বাংলা ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাশ হইত; কবি সেই ঘরেই আসিলেন। সেদিনও অবশ্য আমরা বাংলার ছাত্ররা ব্যতীতও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন

প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপককে ছাত্রদের আসনে দেখিতে পাইলাম। কবি আসিয়া অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলে কবির পক্ষ হইতে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাদের নাম ডাকিলেন। তখন আমাদের রবীন্দ্রনাথের বলাকা পাঠ্য ছিল। আমরা কবিকে অনুরোধ করিলাম বলাকার দুই একটি কবিতা পড়াইতে। তিনি কোনও নির্দিষ্ট কবিতা অবলম্বন না করিয়া বলাকার কবিতাগুলি কোথায় কি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এবং কি মানসিক অবস্থানের মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অনন্যু-করণীয় ভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা বানানের নিয়ম গ্রন্থের ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্র-নাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন।' কবির অনুরোধ অনুসারে শ্যামাপ্রসাদ এ-বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। সদস্য হলেন প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে রাজশেখর বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

কমিটির তিন সদস্য সুনীতিকুমার, চারুচন্দ্র ও বিজনবিহারী একদিন কবির কাছে যান। হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনায় এদিনের সুন্দর বিবরণ পাই—

"রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে সাহিত্য সম্পর্কে কিছু শোনার আগ্রহ ছিল। কিন্তু বাধা পড়ল সুনীতিবাবু, চারুবাবু ও বিজন ভট্টাচার্যের আগমনে।

'তারপর কি খবর?' রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

বানান পরিষদের দায়িত্ব পড়েছে ঘাড়ে। তাই বাংলা বানান সম্বন্ধে 'আপনার কিছু মতামত দরকার' বলে, নিজেকে একটু এগিয়ে দিলেন সুনীতিবাবু।

ক্ষণকাল মৌন থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ তো ছিল না কোনদিন। ও পথ মাড়াই নি।...আমার মতামত।

'আপনার মতামত ছাড়া কি বাংলা ভাষার কোনো পরিবর্ত্তন করা চলে। বিশেষ করে আমাদের যুগে যখন আপনাকে পেয়েছি।' বলে সুনীতিবাবু বানানের কথা পড়লেন। 'কতকগুলো শব্দের মৌলিক রূপটা বজায় রাখবার জন্য চলতি বানান কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করতে চাইছি।'

'যথা?' রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

সুনীতিবাবু বললেন, 'যেমন গরু। আমরা বানান লিখি গরু। কিন্তু আমার মনে হয় শব্দটা গো-রূপা থেকে এসেছে। সুতরাং বানানটা গরু না হয়ে গোরু হলেই ভাল হয়।'

'হাঁ। অন্তত কলেবর বৃদ্ধি হয়। গাইগুলো দিন দিন যেমন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কলেবর বাড়ানো ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে দুধ বাড়বার সম্ভাবনা আছে কি?' রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইলেন। কারো পক্ষেই হাসি সংবরণ করা সম্ভব হল না।

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ এবং আরো দু'শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের মতামত নিয়ে বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের খসড়া হল। খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের সময় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র স্বাক্ষর দেন।

এই সময় আর একটি কমিটি গঠিত হয়। তার কাজ বাংলা পরিভাষা সংগ্রহ। পরিভাষা কমিটির সদস্য হন সুনীতিকুমার, বিজনবিহারী ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। সভাপতি রাজশেখর বসু, সম্পাদক চারু ভট্টাচার্য এবং সহ-সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথ এই কার্যে কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এরই বছর দুই পরে ১৯৩৮ সালে কবি তাঁর গ্রন্থখানি ভাষাচার্যকে উৎসর্গ করেন।

—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

অধ্যাপক সুনীতিকুমার বহু ভাষা জানতেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—নানা দেশের শব্দমহলের এমন কি তার প্রেতলোকের হাট-হদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। তাঁর মুখে শুদ্ধ উচ্চারণে প্রাচীন গ্রীক, লাতিন, আরবী, পারসিক, বৈদিক প্রভৃতি ভাষার কবিতার আবৃত্তি শুনে বিজ্ঞজনেরাও বিস্মিত হয়েছেন। দিল্লীতে একবার একজন আরবী-ভাষী মুসলমান সজ্জন সুনীতিকুমারের মুখে কোরানের আবৃত্তি শুনে আমাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রফেসর কি কাইরোর আল্-হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন?'

সুনীতিকুমারের মুখে প্রাচীনকালের বিশুদ্ধ উচ্চারণে হোমারের 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যের প্রথম সর্গের অনর্গল আবৃত্তি শুনে খাস গ্রীক মহিলাকেও বলতে শুনেছি, 'কী আশ্চর্য!' কিন্তু সুনীতিকুমার সম্পর্কে এহবাহ্য। তাঁর সমস্ত অন্বেষার মূলে ছিল হিউম্যানিজম। এই হিউম্যানিজম দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ছিল বিশ্বগ্রাসী ইউনিভার্স'াল হিউম্যানিজম। তিনি বিশ্বাস করতেন সমগ্র মানবজাতি একটি পরিবার বিশেষ। মানবজাতিকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা তাঁর মতে ভুল। সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই সত্তার অভিব্যক্তি তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিভিন্ন জাতির জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে এক অখণ্ড সার্বজাতিক মানব-সংস্কৃতি। রূপের বৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে বিস্মিত করেছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কোনো দেশই তাঁর কাছে বিদেশ ছিল না। যেখানেই মানুষ, সেখানেই তাঁর স্বদেশ। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন 'আন্তর্জাতিকতাবাদী'।

শাস্ত্রের অপৌরুষেয়তা তিনি মানতেন না। সব শাস্ত্রই মানুষের রচনা—ঈশ্বরের বাণী কিছু নয়। তিনি ছিলেন অবসক্রান্টিজমের

ঘোর শত্রু! কোনো বাবাজীর, মাতাজীর কৃপা লাভের জন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তিনি কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নেন নি। প্রেম আর রসানুভূতি তাঁর মধ্যে ছিল প্রগাঢ়, কিন্তু ভক্তির আবিলতা কণামাত্র ছিল না। তিনি বলতেন: কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার দুটি পথ আছে—(১) বিশ্বাসের পথ ( অনেক সময়েই অন্ধ বিশ্বাস ), (২) যুক্তি ও বিচারের পথ। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় পথের পথিক। তাঁর মতে, এই পথই ছিল ভারতীয় চিন্তা-নেতাদের কাম্য। এই পথেই সুনীতিকুমার আনন্দলোকে উত্তরণ করেছেন। কিন্তু সুনীতিকুমার কখনো নিজের মত অন্যের উপর চাপাতে চেষ্টা করেন নি। আমার মত বা পথই শ্রেষ্ঠ, একথা কখনো তিনি বলতেন না। তিনি বলতেন, প্রত্যেকেই তাঁর শিক্ষা আর রুচি অনুযায়ী নিজের নিজের মত আর পথ স্থির করে নেবে। যা প্রেয়, তা-ই শ্রেয় নাও হতে পারে, কিন্তু কেউ যদি কোনো বিশেষ মতে বা বিশ্বাসে যথার্থ-ই আনন্দ পেয়ে থাকে, তাঁর জীবনের চরিতার্থতা লাভ করে থাকে, তা'হলে তাঁর পক্ষে সেই মতই সার্থক।

সুনীতিকুমার কোনো শাস্ত্র-নিবন্ধ ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না, দেবতাবাদে অবতারতত্ত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি জানতেন, দেবতা মানুষের সৃষ্টি, স্বর্গ নরক মানুষের কল্পনা। পাপ পুণ্যের প্রচলিত শাস্ত্রীয় ধারণা তিনি মানতেন না। কিন্তু তিনি বলতেন অনেকের প্রশ্নের উত্তরে চিঠিতে লিখেছেনও, প্রচলিত ধ্যানধারণায় আস্থা না থাকলেও, তিনি নাস্তিক নন,। নাস্তিক-এর একটি নিজস্ব সংজ্ঞা ছিল তাঁর। যাঁরা বলেন কিছু-ই নাই, তারা নাস্তিক। সুনীতিকুমার এই অর্থে নাস্তিক ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি অদৃশ্য শক্তি আছে—'আনসিন রিয়ালিটি'—'তৎ সৎ'—যার লীলা চলেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, মানবজীবনেও। 'খেলতি পিণ্ডে, খেলতি অণ্ডে।' কিন্তু এই 'সৎ' শক্তির স্বরূপ স্বস্তবতঃ অজ্ঞেয়। শেষ কথাটি কেউ-ই বলতে পারে না। পরম সত্যের চরম জ্ঞান, তাঁর

বিশ্বাস মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মানুষ যা জেনেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তার অজানা। তাই প্রকৃতই যিনি জ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানের দম্ভ নেই, আছে নিরভিমান বিনয়, আছে অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা'। জিজ্ঞাসা মানুষের থাকবেই, সংশয়ও থাকবে। জানার সাধনাও চলবে নিরবধিকাল।

আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'স্যার, আপনার ভাবনায়, আপনার কর্মে, কোথায় কোথায় স্ববিরোধিতা আর অসঙ্গতি লক্ষ্য করি'।

তিনি বলেছিলেন, 'যে-মানুষ বেঁচে আছে, যে মানুষ ভাবে, কাজ করে, তার মধ্যে কিছু দ্বন্দ্ব, কিছু সংশয়, কিছু অসংগতি থাকবেই। যতদিন দেহ, ততদিন সন্দেহ। মরে গেলে আর ভাবনার বালাই থাকবে না।'

হিন্দুস্থান পার্কে সুনীতিকুমারের নিজস্ব বাড়ি যখন তৈরি হয়, তখন একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলেন, 'আমার একটা নিবেদন আছে।'

রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, 'কী নিবেদন?'

সুনীতিকুমার বললেন, আমার ইচ্ছা, আমার বাড়িতে আপনার হস্তাক্ষর খোদাই করে রাখবো। আপনি কয়েকটি ছত্র নিজের হাতে লিখে দিন।'

রবীন্দ্রনাথ একটু ভেবে বললেন, 'নোতুন কিছু লিখে দেবো।'

সুনীতিকুমার হাত জোড় করে বললেন, 'আপনি যাই দেবেন, আমি মাথায় করে রাখবো। কিন্তু......'

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। সুনীতিকুমার বললেন, 'আমি ঠিক যেমনটি চাই, আপনার নোতুন লেখাটি ঠিক তেমনটি না হতেও পারে। আমি চাইছি, আপনার বিশেষ একটি কবিতার তিনটি ছত্র আপনি নিজের হাতে লিখে দিন।'

রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের ইচ্ছা পূরণ করলেন। 'সুধর্মা'র

দোতলায় সুনীতিকুমারের শোবার ঘরের পূব দিকের দেওয়ালে তাকালেই চোখে পড়বে ঃ

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি।
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি।'

আমার গ্রীক প্রীতি ছাত্রাবস্থা থেকেই। মাঝখানে কিছুকাল নানা কারণে যেন পাথরচাপা হয়ে পড়ে ছিল। ১৯৫০ সালে সুনীতিকুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যেন বন্দীমুক্তি ঘটলো। রবীন্দ্রানুরাগে আর গ্রীক প্রীতিতে আমরা দু'জন ছিলাম সমানধর্মা। অধ্যাপক মহাশয় নিজের বিশাল গ্রন্থাগারে প্রাচীন গ্রীক কাব্য নাটক শিল্প ইতিহাসের প্রচুর বই। গ্রীক ভাস্কর্য আর স্থাপত্যের ছবির বইও অনেক। তার মিউজিয়ামে আলমারির থাকে চীনা নিগ্রো ভারতীয় গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শন যে কোনো শিল্পরসিকের নয়ন মন হরণ করে নেয়। ঘরের বাইরে প্রকৃতির কৃষ্ণচূড়ার বিস্ময়, ঘরের মধ্যে মানুষের সৃষ্টিতে বিস্ময়। কত দিন এই বিস্ময়ের বাহুপাশে ব্রহ্মাস্বাদসহোদরসুখ অনুভব করেছি। দিনের পর দিন আমি এই সব শিল্পবস্তু দেখেছি, বই খুলে ছবির পর ছবি দেখেছি, সুনীতিকুমারের মুখে মূল ইয়োনিক গ্রীক হোমারের আবৃত্তি শুনেছি। একদিন লোভ সংবরণ করতে না পেরে বললাম, স্যার, গ্রীক ভাস্কর্যের ছবির বই আমার একখানি চাই। আপনার তো অনেক-ই আছে। বলতেই তিনি আলমারি খুলে খানপাঁচেক বই টেনে বার করে আমার সামনে টেবিলের উপর রেখে বললেন, 'বেছে নিন'। আমি সাগ্রহে ছোটো একখানি বই নিয়ে ব্যাগে পুরলাম। বইখানি আমার একটি সম্পদ।

একবার পুরীতে সুনীতিকুমারের সঙ্গে একটি আর্ট এম্পোরিয়ামে গিয়েছি। ভিতরে ঢুকে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। একটি ঘরে ছোট দুটি মূর্তি দেখে আমার খুব ভালো লাগে। বার বার ঘুরে-ফিরে সেই মূর্তি দুটির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি। দাম শুনে দমে গিয়েছি। স্যার

আমার আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন, আর আমার মুখের ভাব দেখে আমার মানসিক অবস্থাটাও অনুমান করেছেন। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে মূর্তি দুটি দেখছি, তিনি সেখানটায় এসে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে মূর্তি দুটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। নিজের পকেট থেকে দোকানীকে দাম দিয়ে মূর্তি দুটি হাতে নিয়ে আমাকে সংগে করে বেরিয়ে এলেন। তাঁর স্ত্রীও তখন সঙ্গে ছিলেন। গাড়িতে বসে মূর্তি দুটি স্ত্রীর হাতে দিলেন। স্বর্গদ্বারের কাছে একটি হোটেলে আমি উঠেছিলাম, গাড়ি সেই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি গাড়ি থেকে নামলাম। গুরুপত্নী মূর্তি দুটি আমার হাতে দিয়ে বললেন,—'নিন আপনার জিনিষ। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য।' বুঝলাম, দু-জনের মধ্যে আগেই কথা হয়েছে।

আধুনিক অ্যাবস্ট্রাকট আর্টে সুনীতিকুমারের রুচি ছিল না। তবু তিনি আধুনিক আর্টের প্রদর্শনীতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে বহুবার এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ছবির প্রদর্শনীতে গিয়েছি। একবার তরুণ শিল্পীদের বিমূর্ত শিল্পের কতকগুলি ছবি দেখে আমাকে বললেন,—আপনারা বলেন এলিনেশন, দেখুন তার পরিণাম। শিল্পে সাহিত্যে সর্বত্রই এই।

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা সুনীতিকুমারের ভালো লাগতো না। বছর দুই-তিন আগে হবে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-সংগ্রহের পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। প্রকাশক একখণ্ড বই সুনীতিকুমারকে উপহার দেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করি সুধীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা পড়ে দেখতে। তিনি পড়েন, কয়েকটি কবিতা বেশ মন দিয়েই পড়েন, তাঁর ভালোও লাগে। নিজে থেকেই প্রকাশককে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিতে অল্প কয়েকটি কথায় সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। খোঁজ-খবর রাখবার অবসরও পেতেন না। অসংখ্য বই তাঁর কাছে

আসতো। সব বই-ই একটু আধটু চেখে দেখতেন। একটু ভালো লাগলে কোনো কোনো বই পড়েও ফেলতেন। নিজে যেচে লেখককে ডেকে উৎসাহ দিতেন। কাগজে আবছুল জব্বারের লেখা পড়ে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান। তাঁর একখানি বইয়ের ভূমিকাও লিখে দেন। আজকে জব্বার সাহেবের যে লেখকখ্যাতি তার জন্যে তিনি সুনীতিকুমারের কাছে ঋণী। শংকরের বই তিনি যেমন পড়তেন—তাঁর লেখা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বইখানি খোঁজ করেছিলেন। সমরেশ বসুর 'কোথায় পাব তাকে' বইখানি যখন সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে বেরোতে থাকে, তখন তার কিছু কিছু অংশ হয়তো পড়েছিলেন। বই হয়ে বেরিয়েছে শুনে তিনি আমাকে বলেছিলেন এক খণ্ড সংগ্রহ করতে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। হালে কারোর লেখাতে কিছু ভালো লাগলে, তার সমাদর করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু তিনি বলতেন, 'যার মন মজেছে রবীন্দ্রনাথে, এই বয়সে তার কি এ সব মনে ধরে।'

আমাদের দেশে কিছু দেশপ্রেমিক আছেন যাঁরা থেকে থেকে জাতীয় সংহতির ধুয়ো তোলেন। তাঁরা মুখে ঠিক প্রকাশ করেন না অন্তরে পালন করেন, সে হচছে এই যে, ভারতে ভাষার আর লিপির বৈচিত্র্য, জাতীয় সংহতির অন্তরায় ভারতীয় জাতীয়তা গঠনের পথে বাধা। এঁরা বৈচিত্র্যকে বরদাস্ত করতে পারেন না, এঁরা ভারতেব ইতিহাস জানবার চেষ্টা করেন না। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধরতে পারেন না। ভারতের এই ভাষা-সমস্যা তথা জাতি সমস্যা নিয়ে সুনীতিকুমার অনেকই ভেবেছেন, লিখেছেনও অনেক। এ বিষয়ে তাঁর সর্বাধুনিক রচনা India : A polyglot nation and its linguistic problems vis-a-Vis-Nation Integration.

যাঁরা এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, এই বইখানি পড়ে দেখতে পারেন।

রামায়ণ নিয়ে তিনি কী বলেছেন কতটুকু বলেছেন তা না জেনেই ভক্তিমান পুরুষেরা তাঁদের বক্তৃতায় আর লেখায় তাঁর মুণ্ডপাত করেছেন। তাঁকে সবংশে নিধন করার ভয় দেখিয়ে তাঁর নামে বেনামী চিঠিও এসেছে। এ-রকম একখানি চিঠি পেয়ে তিনি আমায় বলেছিলেন, 'মারতে চাস মারবি, কিন্তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারিস নে। এক কোপে কাটবি কিংবা এক গুলিতে মারবি।' বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের দেশে তাঁদেরই স্বজাতির শিক্ষিতম্মনাদের মধ্যে এই অবসক্রান্তিজনের এই প্রাবল্য লক্ষ্য করে তিনি শংকিত হয়েছিলেন।

**—অনিলকুমার কাঞ্জিলাল**

আমার উপর ফরমাস হয়েছে আমার শ্বশুর মহাশয়ের ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখবার। প্রথমেই ভাবছি কোথা থেকে শুরু করব। যাঁকে আমি দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে প্রতিদিন দেখেছি, বাবার মত ভক্তি করেছি, সেবা করেছি, যাঁর কাছ থেকে কন্যার অধিক স্নেহ পেয়েছি, তাঁর বিষয় কিছু লেখা আজ বড় কঠিন। আমি প্রথম যখন বাবাকে দেখলাম, বাবার সংস্পর্শে এলাম, সেই শুরু থেকে শুরু করাই বোধহয় ভাল হবে।

১৯৪৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস। একদিন স্কুল থেকে ফিরতেই মা বললেন, "তাড়াতাড়ি স্কুলের পোষাক বদলে তৈরী হয়ে নাও। সুনীতিবাবু ও তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসবেন, তুমিও সে-সময় সামনে থেক, আজ আর বিকেলে পড়ে কাজ নেই।" আমার তখন টেস্ট পরীক্ষা চলছে। পরদিন ইংরাজী পরীক্ষা। এদিকে এতবড় একজন পণ্ডিত আসছেন, তাঁর সামনে কি বলব না বলব এইসব ভেবে আমি ত প্রমাদ গুণলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই

বাবা ও মা আমাদের বাড়ী এসে পৌঁছুলেন। বাবা পরেছেন সাধারণ মিলের ধুতি, সুতির সাদা পাঞ্জাবী, কাঁধে মুগার চাদর। সৌম্য মূর্তি, হাসি হাসি মুখ, ঝকঝকে চোখ, শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। আর মা পরেছেন লালপাড় তাঁতের শাড়ী, সাদা জামা, কপালে সিঁদুর, টিপটি ঝলমল করছে। সেই প্রথম বাবাকে দেখলাম, মাকেও। দু'জনকেই প্রণাম করলাম। বাবা সস্নেহে ডেকে কাছে বসালেন। এমন স্নেহপূর্ণভাবে স্কুল, পড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা ছোটখাটো প্রশ্ন করতে ও কথা বলতে লাগলেন যে খানিকক্ষণের মধ্যেই আমার ভয় কেটে আমি বেশ সহজ হয়ে গেলাম। ঘণ্টাখানেক কাটার পর বাবাই আমার শ্বাশুড়ীকে ডেকে বললেন "ওগো, একে তোমরা এবার ছেড়ে দাও। টেস্ট পরীক্ষা চলছে, এখন শুধু বসিয়ে রেখে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।" আমি ত মনে মনে খুব খুশী হচ্ছি ওঁর এই সহানুভূতি দেখে। কিন্তু আমার দুই মা-ই এই ব্যাপারে সমান অবুঝ। ওঁরা বললেন, "সারা বছর ত পড়েছে, এখন এক বেলা না পড়লে কি আর এমন ক্ষতি হবে! আর একটু থাকুক।" বাবা এদিকে আমার অবস্থা বুঝে ছটফট করছেন, অথচ জোর করে ওঁদেরও কিছু বলতে পারছেন না। এইভাবে ন'টা অবধি কাটিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। সেই প্রথম দিনেই এইভাবে বাবার স্নেহের, তাঁর অপরের সুবিধে-অসুবিধে বোঝবার ক্ষমতা ও অন্যের সামান্য অসুবিধেতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ার পরিচয় পেয়েছিলাম।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার সময় বাবা সমানে বসেছিলেন। এখন যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ওঁর মা ও বাবার কথা ভেবে মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলছেন। মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলির মানে ও তাৎপর্য নিয়ে যখন আলোচনা করছিলেন, তখন তার মানে বুঝে আমিও নিজেকে গৌরবান্বিতা ও ভাগ্যবতী

মনে করছিলাম। এর আগেও-ত আমার দিদির বিয়ের সময় ও অন্য বিবাহে কতবারই বিবাহের মন্ত্র শুনেছি। কিন্তু এমন করে তার মানে ও তাৎপর্য কোনদিনই কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। ফলে মন্ত্রগুলি কতকগুলি অবোধ্য সংস্কৃত শ্লোকই রয়ে গিয়েছিল। আমরা ত ছোট থেকেই জানি, ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় মাকে বলে যায় "মা, দাসী আনতে যাচ্ছি"। বাবাই প্রথম বোঝালেন, আমাদের বিবাহের মন্ত্রে আছে, "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভবঃ"। তার মানে "শ্বশুরগৃহে সম্রাজ্ঞীর মত বিরাজ কর"। বাবা বললেন, "ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, তাঁকে আমরা ঠাকুমার দেখাদেখি বউমা বলতাম। বাদলের বউকেও আমি বউমা বলবো"। এইভাবে মায়ের স্থান দিয়ে, সম্মান দিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন।

সংসারে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যখনই মন চঞ্চল হয়েছে বাবার কাছে ছুটে গেছি, বাবা ছোটখাটো উপদেশ ও কথার মধ্যে দিয়ে মনকে শান্ত করে দিয়েছেন। বাবা বলতেন, "বউমা, সংসারে কেউ আসে দিতে, কেউ আসে নিতে। কেউ আসে ভোগ করতে, কেউ আসে সেবা করতে। তুমি ভাব্‌বে আমি দিতে এসেছি, সেবা করতে এসেছি। তা'হলে আর কোন কিছুতেই কষ্ট পাবে না। যা পাবে সেটা পাওনা নয়, উপরি পেয়ে গেছি ভাববে, তাতে অল্পেই সন্তোষ পাবে"।

বাবার মত এত অল্পেতেই খুশী হতে, সন্তুষ্ট হতে আর কারোকে কখনও দেখিনি। নিজের, পরের, সবার জন্য এমন সমানভাবে চিন্তা করতেও আর কাউকে দেখিনি। বাড়ীতে কোন চাকরের অসুখ করেছে, বাবা দিনের মধ্যে তিন-চারবার নিজেই যাচ্ছেন তাকে দেখতে। সে কি খাবে না-খাবে জিগ্যেস করছেন। তাকে কি ওষুধ দিলাম খোঁজ নিচ্ছেন, এতো শেষদিন অবধি দেখেছি।

বাবা খুব খেতে ভালোবাসতেন এ খবর অনেকেই জানেন, কিন্তু বাবা যে তার থেকেও কতবেশী খাওয়াতে ভালোবাসতেন সে খবর অনেকেই জানেন না। বিয়ের পর দেখেছি বাবার কাছে একটি

জাপানী ছাত্র প্রতি রবিবার পড়তে আসত প্রায় বছরখানেক ধরে। প্রতি রবিবার সকাল থেকেই বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তাকে কি খাওয়াবেন সেই চিন্তায়। জাপানীরা মাছ ও ভাত খেতে ভালোবাসে। তাই তার জন্য তিন-চার পদ বিভিন্ন রকম মাছ রান্না না করিয়ে তাঁর শান্তি হত না। তাকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে এত তৃপ্তি পেতেন যে মনে হত যেন নিজেই খেয়েছেন। তিন-চারটি গরীব ছেলে এবাড়ী থেকে খেয়ে পড়াশুনো করত। বাবা সব সময় তারা ঠিকমত খেয়েছে কিনা বামুন ঠাকুরের কাছে নিজেই খোঁজ করছেন দেখেছি। বাড়ীতে হয়ত কারোকে খাওয়ানো হবে। বাবা সকাল থেকেই খোঁজ নিচ্ছেন কি কি রান্না করা হবে। যাঁরা খাবেন তাঁদের বিশেষ কোন খাদ্যের প্রতি বিশেষ প্রীতির খবর আমাদের কিছু জানা আছে কিনা। লোককে খাইয়ে এত তৃপ্ত হতেন যে, বলার নয়। যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হেড এগ্‌জামিনার ছিলেন বাড়ীতে খাতা দেখার সময় সবার জন্য বিকেলে জলখাবারের এলাহি ব্যবস্থা করতে হত। বাড়ীতে কোন বিদেশী অতিথি সকালে বা বিকেলে চায়ের সময় এলে তাঁদের ভালো ঘিয়ে চিড়ে ভাজা, কড়াইশুটির ঘুগ্‌নি ও কিসমিস, বাদাম দিয়ে তৈরী সুজির হালুয়া খাওয়াতে ভালো-বাসতেন। তাঁরাও দেখতাম বাজারের মিষ্টি, সিঙ্গাড়ার চেয়ে এই খাবার বেশ তৃপ্তি করেই খেতেন। বাবা বলতেন সন্দেশ, রসগোল্লা আমাদের যতই প্রিয় হোক বিদেশীদের রসনা এত বেশী মিষ্টি খেতে অভ্যস্ত নয়। তাই তাদের ওসব মিষ্টি খেতে বেশী অনুরোধ করা উচিত নয়।

বাবা অনেক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করতেন, কিন্তু সে বিষয়ে কোন উল্লেখ তিনি পছন্দ করতেন না। দুপুরে বা রাত্রে ভিখারিণীর "মাগো দুটি খেতে পাই মা" ডাক শুনে শুনে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে তা আর সবসময় মনকে তেমন নাড়া দেয় না। অথচ বাবা ঐ ডাক সহ্য করতে পারতেন না। ছুটে এসে বলতেন, "বউমা,

তোমার রান্নাঘরে কিছু বাড়তি ভাত বা রুটি হবে নাকি? দাওনা ওকে"। বাবার আকুলতা দেখে বলতে পারতাম না যে, আজকাল রেশনের যুগে বাড়তি দু'-একজনের মত ভাত রাখার অভ্যাস আমরা গৃহস্থ বাড়ীতে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। সবার থেকে দু'-এক মুঠো কমিয়ে তাকে দিতে হত। সে ত নিত্যকার ঘটনা। শীতের সময় কোন ভিখারিণীর ছেঁড়া পোষাক বা বাচ্চার খালি গা দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ঐভাবেই ছুটে এসে বলতেন, "দেখ ত বাপু, তোমাদের একখানা পুরনো কাপড় হবে কি না!" আমি হয়ত একদিন বললাম, "বাবা ওদের দিয়ে দেখেছি, খানিক বাদেই সেটা বদলে ঐ ছেঁড়া কাপড় পরেই আবার ভিক্ষা করবে"। বাবা বলতেন, 'অভাব বলেই ত করে বৌমা। এবার দিয়ে দেখ, যদি না পরে ত একে আর দিও না"। এইভাবে মানুষের উপর তাঁর অসীম মমতা ও বিশ্বাসের পরিচয় বার বার পেয়েছি।

এই ত সেদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এই বছরই বৈশাখ মাসের শেষের দিকে একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাস্তার দিকের গাড়ী বারান্দায় গিয়ে দেখি আমাদেরই বাড়ীর সামনের ফুটপাথে, প্রচণ্ড রোদের মধ্যে মধ্যবয়সী একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে বেশ ভিড়, কিন্তু কেউই কিছু করছে না। আমরা যতই ওদের বলছি মেয়েটির মাথায় একটু জল দিতে বা আমাদের বাড়ীর সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় এনে শোয়াতে, কেউ কিছুই শুনছে না। এদিকে মেয়েটির হাত ফুটপাথের গরমে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। বাবা ত এই সব দেখে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। পারলে নিজেই নীচে গিয়ে ওর শুশ্রূষা করেন, এমন মনের অবস্থা। শেষে আমাদের বাড়ীর চাকর-ড্রাইভার মিলে তাকে গাছের ছায়ায় এনে তার মুখে, মাথায় জল দিতে তার জ্ঞান ফিরে এল। বাবা এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার পোড়া হাতে ওষুধ দেবার জন্যে, তার ভিজে কাপড় বদলাবার জন্যে

একটি কাপড় ও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্যে। আমি তার জন্য তুলো, বারনল, একটি পুরনো কাপড় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করার পর একটু শান্ত হয়ে বললেন, "ওকে বল এখন খেয়ে, রোদ না পড়া পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে বিশ্রাম নিতে। রোদ পড়লে বাড়ী যাবে। কিন্তু ওর বাড়ী ত বরানগরে বলছে। এতটা পথ যাবে কি করে। ওকে বাস ভাড়া ও রাত্রে খাবারের জন্যে কিছু পয়সা দাও।" আমি বাস ভাড়ার জন্য একটি ও খাবারের জন্যে দু'টি টাকা দিলে, নিজে আবার দু'টি টাকা দিয়ে পাঁচটি টাকা পুরো করে ওকে দিয়ে তবে ওঁর শান্তি হল। এমনই সবার জন্য ওঁর মায়ের মত মমতা ও চিন্তা ছিল।

আমার শাশুড়ীমা খুব ভালো রাঁধতে পারতেন। আমিষ, নিরামিষ দু'রকম রান্নাই তিনি সমান দক্ষতায় রাঁধতেন। বাড়ীতে কেউ খেলে তিনি পুরনো বামুন সব রাঁধতে জানা সত্ত্বেও নিজের হাতে দু' একটি পদ রাঁধতে ভালবাসতেন। বিকেলে খাবার ও নিত্যনতুন রান্না নিজে হাতে করতে ভালোবাসতেন কিন্তু নিজের বৌ বা মেয়েদের রন্ধন পটুতার উপর দেখে বা কারও কাছে শুনে নতুন কোন রান্না করব ঠিক করতাম, বাবা শুনে খুব উৎসাহিত করতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। ঐ রকম কোন পত্রিকায় দেখে মাংসের মেটে, কিমা ও নুড্‌ল দিয়ে একটি রান্না করব ঠিক করলাম। বাবাকে বলতে, বাবা ত খুব উৎসাহিত করলেন আমায়। বাবার ছেলেকে কিন্তু জানালাম না। সকালবেলায় তার নানা উপকরণ জোগাড় হল। বিকালবেলায় বেশ পরিশ্রম করে ঐ রান্না শেষ হলে খুশী মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম, বাবা এবং তাঁর ছেলে অফিস থেকে ফিরলে খাইয়ে একেবারে অবাক করে দেব। বাবা আগে ফিরলেন। আমি ত তাড়াতাড়ি বাবা মুখহাত ধুতে ধুতে গরম করে নিয়ে এলাম। বাবা খুব উৎসাহ করে খেলেন, আমাকে খুশী করতে আর একটু চেয়েও নিলেন। আমিও পরিতৃপ্ত

হয়ে এবার বাবার ছেলের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খানিক বাদে তিনি ফিরলে তাঁকেও খেতে দিলাম। তিনি উৎসাহ করে এক চামচ মুখে নিয়েই বললেন, "এ কি? এটা কি হয়েছে? বিশ্রী আঁসটে গন্ধ, আটা আটা মত, ঠাকুর এটা কি করেছ?" আমার অবস্থা তখন বোঝাবার নয়। লজ্জার সঙ্গে বলতে বাধ্য হলাম যে, ঠাকুর নয়, আমিই রেঁধেছি। বাবা কিন্তু আমায় জানতেও দেননি যে, এত বিশ্রী রান্না হয়েছে। আমাকে পরে বললেন, "তাতে কি হয়েছে বৌমা, একেবারেই কি সব ঠিক হয়। রাঁধতে রাঁধতেই ভাল হবে। আমার ত এমন কিছু মন্দ লাগল না বাপু।"

রাত্রে বাড়ীতে কেউ না খেয়ে শুয়ে পড়লে বাবা অস্থির হয়ে পড়তেন ও তাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। আমার ছোট ননদদের মধ্যে কেউ হয়ত পড়া শেষ করেই শুয়ে ঘুমুতে লেগেছে, আর ঘুম ছেড়ে উঠতে চাইছে না খেতে। বাবা শুনে তার কাছে গিয়ে, "রাত্রিবেলা পেটের মধ্যে হাতি নাচবে, ঘোড়া লাফাবে", ইত্যাদি নানা কথা বলে উঠিয়ে হাসিয়ে, খাইয়ে তবে ছাড়তেন।

বাবার সঙ্গে বাবার ছেলের সম্পর্কটিও ছিল বড় মধুর। এঁদের পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত এত নিবিড় ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক, এত স্নেহ ও বিশ্বাসের সম্পর্ক, এত সহজ বন্ধুতার সম্পর্ক আমি আর কোনও পিতা-পুত্রের মধ্যে দেখিনি। বাবার ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে লিখতে বসে তাই এ সম্বন্ধে কিছু না লিখলে লেখা কেমন যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে দেখা যায় পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক হয় ছেলের দিকে মুখ্যতঃ উক্তি, শ্রদ্ধার ও বাধ্যতার আর পিতার দিকে স্নেহের ভরসার ও আদেশের। বাবা ও তাঁর ছেলের মধ্যে সম্পর্ক ছিল একটু অন্য রকমের। দু'জনের মধ্যে অসম্ভব আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিলো। বিয়ের পর থেকেই দেখছি, বাবার সম্পর্কে ওঁর অসম্ভব ভক্তি, শ্রদ্ধা, গৌরববোধ ও ভালবাসা। আর বাবারও ছেলের প্রতি অসম্ভব স্নেহ, বিশ্বাস,

ভরসা ও বন্ধুর মত ব্যবহার। মা ও বাবার মধ্যে প্রায়ই ছেলে কাকে বেশী ভালবাসে এই নিয়ে ঠাট্টা, তর্ক ও অভিমান হতে দেখেছি। মা বলতেন, "আমি এত কষ্ট করলাম, মানুষ করলাম, আর ছেলে এদিকে সব সময় বাপের দিকে আছেন।" বাবা শুনে হাসতেন। ওঁর ২০-২১ বছর বয়সে আমাদের বিয়ের সময় থেকে দেখেছি বাবা কি মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে, কি সাংসারিক যে কোনও বিষয়ে, ছেলের সঙ্গে পরামর্শ না করে ছেলেকে না জিজ্ঞেস করে কোন কিছুই করতেন না। উনিও সকল ব্যাপারেই বাবাকে সাহায্য করার জন্য, বাবাকে সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাবার জন্যে সেই বয়সেই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন ও সংসারে নানা দৈনন্দিন ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, "বাদলের আমার প্রতি ভালোবাসা, যেন গ্রাম্য বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তানের প্রতি অবুঝ ভালবাসার মত। ও যেন আমায় তুলোর বাক্সের মধ্যে রাখতে পারলে বাঁচে।" বাবার স্বাস্থ্য এমনিতে খুব ভাল থাকলেও শেষের দিকে আট-দশ বছর ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেসার ও হাই ব্লাড ক্লোরেস্টল.ইত্যাদি অল্প অল্প হয়েছিল। তাই প্রতি মাসে একবার রক্ত পরীক্ষা, ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা ও ই সি জি করানো হত। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে ও ডাক্তারের পরামর্শ মত তাঁর খাওয়া-দাওয়া ও ওষুধ দেওয়া হত। ডায়াবিটিস বাড়লে মিষ্টি খাওয়া কমাতে হত। উনি হয়ত কোনবার রিপোর্টে ডায়াবিটিস কমেছে দেখে খুশী হয়ে বললেন, "মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে কত তাড়াতাড়ি তোমার সুগার কমে গেল দেখছ ত বাবা।" বাবা মিটি মিটি হাসলেন। পরে বললেন, লুকিয়ে কিনে একটু-আধটু মিষ্টি আমি রোজই খেয়েছি। তাতে কিছুই ক্ষতি হয়নি, দেখলে ত বাপু।"

বাবার কিউরিওর ও লাইব্রেরীর ঘর খুবই প্রিয় ছিল। আমি এ বাড়ীতে যখন প্রথম আসি তখন দেখেছি বাবার লাইব্রেরীর সব

বই একটি ঘরেই ধরে যেত। তারপর ধীরে ধীরে এই আটাশ বছরে বই-এর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন তাঁর বই একটি তলা পুরো ভরে যায়। এত বেড়ে গেছে। কিউরিও-ও সেই অনুপাতে বেড়েছে। বাবা যখনই বাইরে কোথাও যেতেন, সব খরচ বাঁচিয়ে বই ও কিউরিও সংগ্রহ করে আনতেন। টাকা, পয়সা, জামা, কাপড়, ঘরবাড়ী কোন কিছুর প্রতিই তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিল না, একমাত্র বই ও মনের মতো কিউরিও দেখলে লোভ সামলাতে পারতেন না। বাবার ছেলেও বাবার এই দুর্বলতার কথা জানতেন। তাই সুযোগ পেলেই এদেশ ও বিদেশ থেকে বাবার পছন্দমত কিউরিও সংগ্রহ করতেন।

বাবার অতবড় লাইব্রেরীতে কোন্ কোন্ আলমারীতে কোন্ তাকে কোন্ বই আছে তা তাঁর সম্পূর্ণ জানা ছিল। দরকার হলেই সঙ্গে সঙ্গে বার করে ফেলতে পারতেন। এমনই তাঁর অদ্ভুত মনে রাখার ক্ষমতা ছিল। বাবার বইগুলি মনের মত করে গুছিয়ে রাখার জন্যে তাঁর ছেলে বাড়ীর চার তলাটি তৈরী করালেন। অনেক যত্নে, অনেক চিন্তা করে তাঁর প্ল্যান হল। খানিকটা তৈরী হয়ে প্রায় শেষ হয়ে এলে, বাবাকে একদিন উপরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে অবাক করে দিতে চাইলেন। বাবা যদিও সবই কিছু কিছু জানতেন, তবু দেখে খুব খুশী হলেন। ওঁর আশা মত অবাক হলেন ও প্রশংসা করলেন। এদিকে বাবা অনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন নিজের আত্মজীবনী লিখবেন। উনিও মাঝে মাঝে বাবাকে উৎসাহিত করতেন ওটি সুরু করতে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ছানির জন্য খারাপ হতে থাকায় সুরু করতে দেরী হচ্ছিল। বাবা যখন ওটি লিখতে সুরু করলেন, আমাদের বললেন, "বাদলকে এখন কিছু বল না, বেশ খানিকটা লেখা হয়ে গেলে, দেখিয়ে অবাক করে দেব"। এইভাবে ওঁদের বাবা ও ছেলের মধ্যে অবাক করে দেবার খেলা চলত।

বাবা ও তাঁর নাতির মধ্যে সম্পর্কটিও ছিল ভারী মজার।

আমাদের বিয়ের বহুদিন পর, আমাদের একমাত্র ছেলে সুচিৎ জন্মায়। বাবার সে ছিল চক্ষের মণি। দশদিন বয়সে নার্সিংহোম থেকে বাড়ীতে আসার পরদিন থেকেই তিনি ওকে প্রতি সকালে বেদমন্ত্র পাঠ করে শোনাতেন। যখন একটু বড় হল, দাদুর মুখে শুনে শুনে সেও তোতাপাখির মত বেদমন্ত্র পাঠ করতে শিখল। বাবা এতে ছেলেমানুষের মত গর্ববোধ করতেন ও সবাইকে ওর পাঠ শোনাতে চাইতেন। প্রতিদিন স্কুলে যাবার সময়ে ওঁকে প্রণাম করার পর ও রাত্রে শুতে যাবার আগে ওর মাথায় চুমা না দিলে তাঁর শান্তি হত না। সুচিতের পড়া ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। সুচিৎও পড়ার সময় বা কোনো বাইরের বই পড়ার সময় কোনো বিষয়ে না বুঝতে পারলেই ছুটত দাদুর কাছে। জানত ওর সব প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তেই ওঁর কাছে পেয়ে যাবে। এখন ও দিন দিন আরও বড় হবে। ওর জিজ্ঞাসার পরিধি দিন দিন আরও প্রসারিত হবে। কিন্তু সেই 'প্রাণময় বিশ্বকোষ'কে ও আর কাছে পাবে না ওর সব জিজ্ঞাসার সমাধান করে দেবার জন্যে।

বাবা চিরকাল খুব ভোরবেলায় চারটেয় উঠতেন। বাবার জুতোর খট-খট আওয়াজে আমাদের ভোরবেলার ঘুম ভেঙ্গে যেত। ঘুম থেকে উঠে একঘণ্টা খালি হাতে ব্যায়াম করতেন। বাবা যাবার আট-দশ দিন আগে পর্যন্ত এর অন্যথা হয় নি। তারপর বারান্দায় বসে একঘণ্টা খবরের কাগজ পড়তেন ও তারপর সবার সঙ্গে সেই নিয়ে আলোচনা ও গল্প করতেন। সকালে আটটায় খাবার খেতেন। তারপর বসে লেখাপড়ার কাজ করতেন। সেই সময় ৯টার পর থেকে ১২টা পর্যন্ত বহু সাক্ষাৎপ্রার্থী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কেউ কেউ হয়ত তাঁর জলখাবার আগেই এসে হাজির হতেন। আমি বিরক্ত হয়ে বলতাম, "উনি একটু অপেক্ষা করুন। আপনি খাবার খেয়ে দেখা করুন, নৈলে কথায় কথায় খেতে বেলা হয়ে যাবে।" বাবা তাতে রাজী হতেন না। বলতেন, "কতদূর

থেকে হয়ত কোনো বিশেষ দরকারে এসেছে, দেখনা চট করে চুকিয়ে দিয়ে আসব।" এই সময় নানা মজার ঘটনাও মধ্যে মধ্যে ঘটত। একবার এক ভদ্রলোক এসে বাবাকে বললেন, বাবা যদি তাঁর বইকে রবীন্দ্রপুরস্কার বা এ্যাকাডেমি পুরস্কার না পাইয়ে দেন তবে তিনি আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করবেন। বহু কষ্টে বুঝিয়ে, বেশ কয়েকঘণ্টা পরে তাঁকে আত্মহত্যার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়ে বাড়ীতে পাঠানো সম্ভব হল।

বাবা সাড়ে বারোটায় স্নান করে একটায় খেতে বসতেন। খেতে খেতে নানা বিষয়ে গল্প ও আলোচনা করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস ছিল। এই সময় কত যে মজার মজার গল্প করতেন, গল্পচ্ছলে কত বিষয়ে যে কত কথা তাঁর কাছ থেকে আমাদের জানা হয়ে যেত তার শেষ নেই। খেয়ে উঠে জাতীয় গ্রন্থশালায় তাঁর অফিসে যেতেন। সেখানে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নানা চিঠির জবাব, নানা বই ও প্রবন্ধ লেখা, থিসিস দেখা ইত্যাদি কাজ করতেন। তারপর ৬টায় বাড়ী ফিরে আসতেন। গত আট-দশ বছর রাত্রে চোখে ভালো দেখতে পেতেন না বলে সন্ধ্যের পর আর পড়াশুনো করতে পারতেন না। বাড়ী ফিরে খাবার খেয়ে একটু শুতেন ও শুয়ে শুয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা ঘটক, অর্ঘ সেন প্রমুখ গায়ক-গায়িকাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের লংপ্লেয়িং রেকর্ড শোনা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। প্রায় প্রতিদিনই এগুলি শুনতেন। আর ভালোবাসতেন ধ্রুপদ গান। ডাগার ভ্রাতারা যখনই কলকাতায় গান করতেন, বাবা শুনতে যেতেন উৎসাহভরে। ইউরোপীয় বাজনার মধ্যে বীটোফেন ও বাক্ তাঁর প্রিয় ছিল। বিশেষ করে বীটোফেনের "এরইকা" ও "ফিফ্থ সিম্ফনি"। এছাড়াও রবিশঙ্করের বাজনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গানের রেকর্ড, যেমন আর্মেনিয়ান, আরবীয় ও স্পেন দেশীয় গান শুনতে ভালবাসতেন।

রাত্রে ন'টায় খেতে বসতেন। সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে

শুয়ে পড়তেন। তবে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত যতদিন চোখ ভাল ছিলো রাত্রে বারোটা-একটা পর্যন্ত নিজের লাইব্রেরীতে বসে লেখাপড়ার কাজ করতেন দেখেছি। আমরা বেশ একঘুম দিয়ে উঠে দেখেছি বাবার লাইব্রেরী ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

বাবার আর একটি অভ্যাস ছিল কারও কোনও লেখা পড়ে ভাল লাগলেই তাঁকে চিঠি লিখে উৎসাহ দেওয়া। তাঁর ঠিকানা জানা না থাকলে যেখান থেকে তাঁর লেখা বেরিয়েছে সেখানে ফোন করে বা তাঁর পরিচিত কারো সন্ধান জানা থাকলে তাঁর কাছ থেকে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লিখে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে তবে তাঁর শান্তি হত। কোন লেখা ভাল লাগলে আমাদেরও সেটি পড়ে দেখতে ও কেমন লাগল বলতে হত। এইভাবে তিনি বহু অধুনা বিখ্যাত কিন্তু তখন নতুন ও অপরিচিত লেখককে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের প্রথম লেখা পড়েই।

তখনকার পুরোনো যুগের মানুষ হয়েও বাবার মন সামাজিক ও ধর্মীয় সকল দিকেই অত্যন্ত উদার ছিল। কোন ব্যাপারেই গোঁড়ামি সহ্য করতে পারতেন না। মেয়েরা লেখাপড়া করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক এটা সব সময় চাইতেন। আমিও বিয়ের পর যেবার ইংরাজীতে এম-এ পাশ করলাম বাবা ও মার আনন্দ দেখার মত। আত্মীয় বা বন্ধু পরিবারের মধ্যে কেউ আন্তঃপ্রদেশীয় বা অসবর্ণ বিবাহ করলে তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে খাওয়াতেন। তিনি যে তাদের গ্রহণ করেছেন খুশীমনে এটা বোঝাবার জন্যেই।

বাবা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন। কখনও কারও সাহায্য বা সেবার প্রয়োজন তাঁর হয় নি। বাবা বলতেন, "ছুটতে পারলে দাঁড়াবে না, দাঁড়াতে পারলে বসবে না, আর বসতে পারলে শোবে না।" শেষদিন চলে যাবার একঘণ্টা আগেও আমরা, তাঁর বৌমা ও মেয়েরা যখন তাঁর বুকে, পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, মাথায়

বাতাস দিচ্ছি, তিনি তখন অত কষ্টের মধ্যেও জিজ্ঞেস করছেন, "তোমাদের হাত ব্যথা করছে না ত?"

বাবার কথা লিখতে বসে আজ কত কথা ও কত ঘটনাই যে মনে পড়ছে তার শেষ নেই। মনে হচ্ছে, কিছুই লেখা হল না। বাবার বিরাট পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের কথা অনেকেই লিখবেন এবং লিখেছেন। কিন্তু প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনেও তিনি যে কত মহৎ, উদার, স্নেহশীল ও অসাধারণ ছিলেন তার সামান্য পরিচয় যদি এই লেখায় তুলে ধরে থাকতে পারি তা'হলেই নিজেকে সার্থক মনে করব।

—ছায়া চট্টোপাধ্যায় ( আচার্যের পুত্রবধূ )

ভাষাচার্য উপাধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিবাবুর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ যখন সুমাত্রা, জাভা, বালি ও শ্যামদেশ পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন সুনীতিবাবু তাঁর সঙ্গে যান। তিনমাস কাল তিনি ভারতের এইসব দ্বীপাবলির দেশ ঘুরে বেড়ালেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরেছেন এবং বিদেশেও অনেক জায়গায় তিনি ঘুরেছেন। ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে তিনি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়নের জন্য ইউরোপ যান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফোনেটিক্‌সে ডিপ্লোমা ও ডি. লিট. উপাধি পান। তাঁর ডক্টরেট থিসিসের বিষয় ছিল ইন্‌ডো-আরিয়ান ফিললজি। লণ্ডনে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের কাছে নানা বিষয়ে পাঠ করেন।

তারপর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে যোগ দেন ফ্রান্সে। এখানেও তিনি বিভিন্ন অধ্যাপকের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ ও গবেষণা করেন।

এছাড়া তিনি ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড,

পোল্যাণ্ড, জারমানি, বেলজিয়ম ও রোম ইত্যাদি ঘুরেছেন। তাঁর বিদেশ সফরের তালিকা রচনা সহজ কাজ নয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে তিনি যান নি। আবার অনেক জায়গায় তিনি একাধিকবারও গিয়েছেন।

তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় ভারতবাসী মাত্রেই জানেন। বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি ও প্রসার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রথম আলোচনাই তাঁর বিশিষ্ট অবদান। এবিষয়ে সুনীতিকুমারের প্রথম গ্রন্থ 'দি অরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগোয়েজ'—যে বই এখন ও ডি বি এল নামে খ্যাত। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুনীতিকুমারের সুনাম স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়—বেঙ্গলি সেলফ-টট, এ বেঙ্গলি ফোনেটিক রীডার, ইণ্ডো-আরিয়ান এণ্ড হিন্দী কিয়াতজনকৃতি, আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়া ইত্যাদি।

আজ ভাষাতত্ত্ব দেশের অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথাও কম্পারেটিভ ফিলোলজি বা লিঙ্গুইস্টিক পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। সুনীতিবাবুর পরিচালনায় সেই ভাষাতত্ত্বের বিভাগটি বিদগ্ধ সমাজের কাছে শুধু ভারতবর্ষে নয় আন্তর্জাতিক সমাজেও সুখ্যাতি পেয়েছে।

ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গে তিনি ব্যাকরণেও আলোচনা করেছেন। আগে শুধু ব্যাকরণ সূত্র ধরে পড়ানো হত কিন্তু তিনি ব্যাকরণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিনি কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। রেঙ্গুনের অল বর্মা বেঙ্গলি লিটারারি কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। হল্যাণ্ডের সোসাইটি অব আর্টস এণ্ড সায়েন্সের সদস্য ছিলেন। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য ভিজিটিং প্রফেসররূপে

আমন্ত্রণ জানান। অস্‌লোর নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্‌ তাঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচন করেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা'—অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। একটানা আটত্রিশ বছর অধ্যাপনার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব 'খয়রা'—অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নেন এবং তারপর এমারটিস্‌ অধ্যাপক হন। তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন। সাহিত্য একাডেমির সভাপতি হন। এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে সাহিত্য-বাচস্পতি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

এসব কাজ একদিনে হয় নি। স্তরে স্তরে হয়েছে। প্রচুর শ্রম ও নিষ্ঠার জীবনই সুনীতিকুমারের জীবন। নব্বই-এর প্রান্তে পৌঁছাইয়াও তিনি দেহ-মনে ছিলেন সক্ষম, মেধায় সক্রিয় এবং জাগ্রত। দেশকে তাঁহার অধ্যয়নের এবং নব নব উদ্ভাবনের ফল উপহার দিয়া ধন্য ও চরিতার্থ করেছেন।

এই শিক্ষাগুরুর সংখ্যাহীন সুযোগ্য ছাত্র সারা দেশে ছড়াইয়া আছেন। আলোকবর্তিকাটি তাঁহাদের হাতে হাতে অগ্রসর হইয়া যাইবে।

—সুনীলবরণ ভট্টাচার্য

জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতন নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত, সুরসিক এবং মানবদরদী আমি খুব কমই দেখেছি। শুধু প্রাচ্যে নয় পাশ্চাত্যদেশেও তাঁর মতন প্রতিভাবান ও প্রায় সব বিষয়ে গুণী ব্যক্তি খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রয়াত আচার্য সুনীতিকুমারের বহুধা পাণ্ডিত্যের কথা অনেকেই লিখবেন, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয় জেনেই আমি তাঁর শিল্পকলা ও ভাস্কর্য

বিষয়ে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় লাভ করেছি শুধু সেই কথাগুলোই এই রচনায় সংক্ষেপে নিবেদন করছি।

শিল্পবেত্তা সুনীতিকুমার খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তিনি যে-বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন সে-বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুব সহজবোধ্য ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠের বিষয়বস্তু যাতে সহজে বুঝতে পারে সে-জন্যে তিনি প্রায়শঃই বোর্ডে ছবি এঁকে পড়াতেন। অঙ্কন সহযোগে পড়ানো ও বোঝানোর গুণে ছাত্র-ছাত্রীদের দুরূহ পাঠ্যবস্তু এতো হৃদয়গ্রাহী, মনোজ্ঞ ও সহজবোধ্য হত, তা যাঁরা তাঁর ক্লাশে পাঠ গ্রহণের সুযোগ না পেয়েছেন তাঁদের লিখে বোঝানো কঠিন।

শিল্পরসিক সুনীতিকুমারের গৃহে বিশ্বের নানা জায়গা থেকে আহৃত শিল্পসামগ্রী সযত্নে রাখা আছে। তাঁর সংগৃহীত শিল্পসামগ্রীর মধ্যে বহু বরেণ্য ভারতীয় শিল্পীর নানা শিল্পকর্ম শোভা পেত। কিন্তু তিনি নিজে যে একজন উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন সেকথা কোনোদিন কারও কাছে প্রকাশ করতেন না। আমি তাঁর খুব নিকটজনের কাছে শুনেছি তিনি প্রায় তিরিশ চল্লিশটি স্কেচ এঁকেছিলেন। এই স্কেচগুলির মধ্যে কিছু কিছু স্কেচ তাঁর নিকট আত্মীয়দের সংগ্রহে রক্ষিত আছে। তাঁর আঁকা এই স্কেচগুলি দেখলে তিনি কত উচ্চমানের চিত্রশিল্পী ছিলেন তা বোঝা যায়।

রূপতাপস নন্দলাল বসু মহাশয়ের পাথরের ওপর রেখায়িত 'হরপার্বতী' শিল্প নিদর্শনটির প্রতিলিপি তাঁর গৃহের শোভাবর্ধন করেছিল। আচার্য সুনীতিকুমার শিল্পবেত্তা তথা শিল্পরসিক ছিলেন বলেই নন্দলাল বসু মহাশয়ের পরম রমণীয় শিল্পকর্মটির সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম তাঁর গৃহে রক্ষা করে 'সুধর্মা' বাসভবনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। আচার্য সুনীতিকুমারই আচার্য নন্দলাল বসুকে 'রূপ-পতি' নামে আখ্যাত করে সম্মানিত করেন এবং

"দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম দেশ" স্মরণীয় গ্রন্থটি রূপ-পতি নন্দলাল বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

পরম রুচিবান সুনীতিকুমার শুধু ছবি আঁকতে পারতেন না, শিল্প-কলা ও ভাস্কর্য বিষয়ে তাঁর অসীম জ্ঞান ছিল। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যেই (ঠিক সন-তারিখ এ মুহূর্তে স্মরণে আসছে না, সম্ভবত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) কলকাতা শহরে কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পী 'রূপযানী' নামে এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এই সংস্থার উদ্যোগে শিল্পকলা বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা সভা বসতো। স্বর্গত সুনীতিকুমার ছিলেন 'রূপযানী'-র সভাপতি।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় ছিলেন সুনীতিকুমারের অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ ও সোদরোপম সতীর্থ। শিশিরকুমার প্রথম দিকে যে-সব নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন সেই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন সুনীতিকুমার। এ জন্যে সুনীতিকুমারকে কত পড়াশুনো ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা "মনীষী স্মরণে" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী' রচনাটি পাঠ করলে জানা যায়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় সুনীতিকুমার কত উঁচু দরের শিল্পরসিক ও শিল্পবোদ্ধা ছিলেন।

জ্ঞানতাপস সুনীতিকুমারের বাঙলা ও ইংরেজীতে শিল্পকলা সম্পর্কিত বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। "সাংস্কৃতিকী" প্রথম খণ্ডে পাটনায় অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শিল্পকলা বিষয়ে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণটি 'শিল্প-কলা' নামে মুদ্রিত হয়েছে। সুনীতিকুমার যখন এই লিখিত ভাষণটি পাঠ করেছিলেন সে-সময় খুব কম ব্যক্তিই বাঙলা ভাষায় শিল্পকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে তিনি ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে কী গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন প্রবন্ধটি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। আমি উল্লিখিত প্রবন্ধের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলুম।

"...সৌন্দর্য-বোধ ভারতের আর্য্য জাতির মধ্যে যথেষ্ট ছিল—এবং সুসভ্য অনার্য্য জাতিগুলির মধ্যেই যে ভারতের রূপ-শিল্প জন্মগ্রহণ করে, ও প্রথম বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করে, আজকাল একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। জগতে কোনও কিছুকে ভালো বা লক্ষণীয়, প্রধান বা তুলনায় উৎকর্ষযুক্ত হইতে হইলে, তাহার প্রধান উপলব্ধি-যোগ্য গুণ থাকিবে, তাহার সৌন্দর্য্য ; ভারতের আর্য্য জাতির সুপ্ত চেতনায় সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষের পরস্পরের সংযোগ সম্বন্ধে এই প্রকার বোধ বা বিচার ছিল। সেই জন্য 'শ্রী'-শব্দ হইতে সাধিত, 'শ্রী'-র তারতম্য বা অতিশায়ন-বাচক দুইটি শব্দ 'শ্রেয়স্, ( শ্রেয়ান্, শ্রেয়সী, শ্রেয়ঃ )' এবং 'শ্রেষ্ঠ', সংস্কৃত ভাষায় সর্ববিধ উৎকর্ষের, এমন কি চরম বা পরম উৎকর্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। 'শ্রী' শব্দের প্রধান ও প্রাচীনতম অর্থ, নেত্রের সাহায্যে দর্শনীয় দ্যুতিমান্ সৌন্দর্য্য, যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে এই 'শ্রী' বা 'সৌন্দর্য্য' আছে, তাহা-ই 'শ্রেয়স্' তাহাই 'শ্রেষ্ঠ'—সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ দুই যেন মিশিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, কোনও পদার্থ 'সুন্দর' হইলেই মঙ্গলময় হইবে—এই বোধেই সৌন্দর্য্য-বাচক 'কল্যাণ (কল্য)' শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'সুন্দর' ( যে অর্থ 'কল্য'-শব্দের গ্রীক প্রতিরূপ Kalos, Kallos-এ পাই ), 'মঙ্গল, ক্ষেমংকর' এই অর্থে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যের মনোভাব যেন গ্রীক আর্য্যের মতোই ছিল —গ্রীকদিগের Kaloskagathos আদর্শের অনুরূপ—'যাহা সুন্দর, তাহাই ভালো'। আবার, যাহা ভালো করিয়া বুঝা যায়, চিৎশক্তির দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহাই 'চিত্র ( চিৎ-র' ) অর্থাৎ 'সুন্দর'। এইরূপ কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করিয়া জর্মান পণ্ডিত Oldenberg ওল্‌ডেন্‌ব্যার্গ ভারতের আর্য্যজাতির চিত্তে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো একটি সৌন্দর্য্য-বোধের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সহজ সৌন্দর্য্য-বোধের স্রোতস্বতী আর্য্য ও অনার্য্য নির্বিশেষে ভারতের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনো অবলুপ্ত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান তাহার মূর্তি বা রূপ-বিরোধী ভাব-সম্পুট ভারতে লইয়া আসিলেও, রূপরসিক পারস্যের প্রভাব ইতিপূর্বেই এই ধর্মের রূপ-বিরোধিতা অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তুর্কী, ঈরাণী ও অন্য বিদেশীয় মুসলমানের আগমনে এদেশে রূপ-শিল্পের ধ্বংস ঘটে নাই ;—বরঞ্চ, পারস্যের মুসলমান সভ্যতার সহিত ভারতের হিন্দু

মনোভাবের আশ্চর্য্য সাহচর্য্য ঘটায়, ভারতে মোগল চিত্রকলার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।

যে কোনো পাঠক-পাঠিকা উদ্ধৃতিটি পাঠ করলে সুনীতিকুমার গভীর তত্ত্বকে যে কত সহজ করে লিখতে পারতেন তা অনুধাবন করবেন।

ডক্টর সুনীতিকুমার স্বাক্ষর শিকারীদের অটোগ্রাফ দেবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই খাতার পৃষ্ঠায় ছবির সঙ্গে কয়েক পঙ্‌ক্তি মনের ভাবনা লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁর আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবির সঙ্গে এই রকম কিছু স্কেচ পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করলে অগণিত জনের পক্ষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পমনকে জানা সম্ভব হবে। আমাদের দেশে এ ধরনের পুস্তিকার প্রকাশক অনেক আছেন— তাঁদের মধ্যে কেউ এ কাজে ব্রতী হলে খুশী হব॥

—রাণা বসু

সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। যদিও আমার চেয়ে দুই বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি আমাদের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্য ছিল। তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় ভারতবাসীমাত্রেই জানেন। বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও প্রসার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে, প্রথম আলোচনাই তাঁর বিশিষ্ট অবদান। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ ও ডি বি এল এখনো সবচেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। শুধু ভারতীয় ভাষা নয় বিদেশের বহু ভাষাও তিনি জানতেন। ভারতের বহু আদিম অধিবাসীর ভাষাও তিনি জানতেন। বহু কথ্য ভাষা জানতেন। এই ভাষা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা নানা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

তিনি প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে গেছেন। অবসর গ্রহণের পর এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। পরে জাতীয় অধ্যাপক হন। সারা ভারতে তিনি বাংলা

ভাষার অথরিটি বলে পরিচিত ছিলেন। এ রকম পাণ্ডিত্যের খ্যাতি খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি রামায়ণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। একখানা গ্রন্থ লেখারও ইচ্ছা ছিল। শুরু করেছিলেন, শেষ করতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ছিল। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন।

আমার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় সভা-সমিতির মধ্যে। কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে এই পরিচয় সুদৃঢ় হয়।

—রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুনীতিবাবুর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষাগুরু সুনীতিবাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন: ১৯২৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে যখন যোগ দিই এম এ ক্লাশে তখনই তাঁকে প্রথম দেখি। সে আজ ৫০ বছর আগেকার কথা। এই ৫০ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর নিকট প্রতিবেশীরূপেও অনেক দিন কাটিয়েছি। আমি যখন ছাত্র তখন তিনি ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক বলেই সাহিত্যের সকল বিভাগের সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিল। ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, উর্দু প্রভৃতি সকল ভাষারই ভাষাতাত্ত্বিক অংশটির ভার সুনীতিবাবুর হাতেই ছিল। আজ ভাষাতত্ত্ব দেশের অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথাও কমপারেটিভ ফিলোলজি বা লিংগুইস্টিক পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। সুনীতিবাবুর পরিচালনায় সেই ভাষাতত্ত্বের বিভাগটি বিদগ্ধসমাজের কাছে শুধু ভারতবর্ষে নয় আন্তর্জাতিক সমাজেও সুখ্যাতি পেয়েছে। ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গে তিনি ব্যাকরণেও আলোচনা করেছেন। আমরা আগে শুধু ব্যাকরণ

সূত্র ধরে পড়তাম কিন্তু তিনি ব্যাকরণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি অনেক ছাত্র তৈরি করে গিয়েছেন। সেই ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে খ্যাতিমান হয়েছেন। যাঁরা তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র নন তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা একলব্যের মত পরোক্ষ শিষ্য। তাঁর 'অরিজিন এনড ডেভেলপমেনট অফ দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। ১৯২৬ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। তারপর এর দুটি সংস্করণ বেরিয়েছে। তারমধ্যে সর্বশেষ হচ্ছে আমেরিকান সংস্করণ। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যদিও এই বইয়ের মুখ্য বিষয় কিন্তু ভারতীয় যে কোন আর্য ভাষা নিয়ে যাকেই গবেষণা করতে হবে তার পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। সুনীতিবাবুর চলার পথ অনুসরণ করে অনেকে ভারতীয় অন্যান্য ভারতীয় ইতিহাস লিখেছেন কিন্তু তাঁদের সকলেরই আদর্শ ওই গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্বের কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে বারংবার উল্লেখ করেছেন।

ছাত্রের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। তিনি যখন আমাদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলেন তখন বিস্মিত হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই 'আপনি' বলেই সম্বোধন করতেন। পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করতে গিয়েছি, কখনও তিনি পা ছুঁতে দেননি। আমি তখন আশুতোষ কলেজে পড়াই। আমাদের এক সহকর্মী ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক ফণী মুখার্জি। তিনি ট্রামে করে একদিন কলেজে আসছিলেন। সুনীতিবাবুও তখন ট্রামেই যাতায়াত করতেন। ফণীবাবু একটা সিটে বসেছিলেন। ট্রামে তখন আর অন্য ফাঁকা সিট ছিল না। সুনীতিবাবুকে দেখে ফণীবাবু বারবার সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন আর সুনীতিবাবু বারবার তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে বসিয়ে দিচ্ছেন। সে এক দৃশ্য।

—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ঠিকুজীর লেখাই শেষপর্যন্ত সত্য হলো। লেখা ছিল, সাতাশি বছরে ফাঁড়া এবং বিদেশে মৃত্যু হবার আশংকা। তাই অল্প কিছুদিন আগে চোখে ছানি কাটাতে বিদেশে যাবার জন্য আত্মীয়-পরিজন কেউ রাজী হলেন না। অগত্যা, কোলকাতার একটি নামী নারসিংহোমে সাতদিন থেকে চোখে ছানির অস্ত্রোপচার করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলেন জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুস্থান পারকের 'সুধর্মা'র বাস ভবনে ফিরে বেশ সুস্থই ছিলেন তিনি। হাসিখুশি মুখ। হাতে অপর্যাপ্ত সময়। চশমা পেতে দিন কয়েক সময় লাগবে। তাই অবসর সময় কাটাবার জন্য তিনি সকলের সঙ্গে গল্প করে সময় পার করছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ বজ্রপাতের মতো দুঃসংবাদ বয়ে এলো। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। সাতাশি বছরে ফাঁড়া ফলে গেল।

হায়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার আজ আমাদের মধ্যে নেই। মনে করতে কষ্ট হলেও এই নির্মম সত্যকে স্বীকার করে নিতেই হবে। এ যে নিয়তির বিধান! কিন্তু সাতাশি বছর বয়সে এই মহাপ্রাজ্ঞ মনীষীর জীবনদীপ নির্বাপিত হলেও তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন প্রখর প্রতিভায় উজ্জ্বল। অমলিন।

আচার্য সুনীতিকুমারকে প্রথাগত চিন্তায় অথবা সংস্কারে তাঁর জ্ঞান-সন্ধিৎসাকে মুহূর্তের জন্যও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। মাত্র কিছুদিন আগেই-তো রামায়ণ সম্পর্কে দেবত্ব ও ঐতিহাসিকতা বিষয়ে যুক্তিসম্মত কিন্তু প্রথা বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে চাঞ্চল্যকর চিন্তাধারার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এতো তাঁর অকুতোভয় দীপ্ত মনীষার পরিচয়। দেশাচার অথবা অন্ধসংস্কার সুনীতিকুমারের সত্য-নিষ্ঠাকে কখনও ম্লান করতে পারেনি। বরং উজ্জ্বল করেছে বরাবর।

জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন বিদ্বজ্জন সমাজে এক সুমহান প্রতিভূর মতো। মানবিকী বিদ্যার জ্যোতিষ্মান প্রতিনিধিরূপে তিনি বিশ্বসভায় অজস্র প্রশংসাপত্র লাভ করেছেন। ভারতবর্ষেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে। তাই তো তাঁকে বাংলাভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পথিকৃৎ বলা হয়। ভাষাতত্ত্বকে যাঁরা সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যায়তনে তার প্রাপ্য আসন দেন সুনীতিকুমার তাঁদের অগ্রণী। বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশ শীর্ষক রচনা তাঁর গবেষণা গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে তা আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের আকর গ্রন্থ রূপেই চিহ্নিত হয়ে আছে। বস্তুত সুনীতি-কুমার আমৃত্যু জাতীয় অধ্যাপক এবং মহান গুরুর সম্মানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সুনীতিকুমার জ্ঞান চর্চায় ছিলেন অক্লান্ত সৈনিকের মতো। শেষ জীবনেও তিনি যুবকের মতো পরিশ্রম করতে দ্বিধা করেন নি। বিশ্বের সকল দেশেই তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তিনি সে সব দেশে জ্ঞানীগুণি সমাবেশে ভারতীয় ভাষার প্রতিনিধিত্বও করেছেন অনেকবার।

ভারত সরকার ১৯৫৬-৫৭ সালে সুনীতিকুমারকে সংস্কৃতি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। চেয়ারম্যান থাকাকালীন তিনি সংস্কৃত চর্চার পক্ষে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন।

আজও মনে পড়ে, ভাষাক্ষেত্রে গোড়াতে তিনি রাষ্ট্রভাষা হিন্দির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জবরদস্তি হিন্দি চাপানোর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানান। তখনও তিনি ভাষা কমিশনের একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁর বলীয়ান প্রতিবাদে শেষপর্যন্ত তা রদ হয়। শুধু এতেই ক্ষ্যান্ত হলেন না। আঞ্চলিক ভাষাসমূহের যথাযোগ্য মর্যাদার জন্য প্রবল দাবী জানান। নেপালী এবং মৈথিলি ভাষার স্বীকৃতির অনুকূলেও মত প্রকাশ করেছেন। তাতে সুনীতি-

কুমার যে শুধু উদারতারই পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতের ভাষাসমন্বয় ও সংহতির পথও দেখিয়ে গেছেন সুস্পষ্ট ভাবে।

অজস্র বিষয়ে সমান আগ্রহ ছিল সুনীতিকুমারের। রাজনীতিতেও তাঁর মনের দুয়ার বন্ধ ছিল না। সেখানেও তিনি বহু ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। আবার স্মরণ করা যেতে পারে, শিশির-কুমার প্রবর্তিত নাট্য আন্দোলনে তাঁর উৎসাহ ও সাহচার্যের কথা। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়েও তাঁর অসামান্য রসজ্ঞ নিবন্ধ-নিবেদন। আফ্রিকার নব অভ্যুদয় নিয়েও বৃদ্ধ বয়সে তাঁর লেখালেখি অক্লান্ত পরিশ্রমেরই সাক্ষ্য বহন করে। সেখানকার সমাজ, শিল্প ও ভাষা বিষয়ে তাঁর যে বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা অসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমারের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। কবি ছিলেন তাঁর অসাধারণ মনীষার গুণগ্রাহী। তা না হলে 'শেষের কবিতা'র অজিত রায় ছাড়া তাঁর আর কোন নায়ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ও পড়তে লাগল সুনীতি চ্যাটুজ্যের বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব।' কবির হাতে এতবড় বখশিষ আর কারও ভাগ্যে জুটেছে কিনা আমার জানা নেই।

সুনীতিকুমারের অনেক কৃতিত্বের মধ্যে আরও একটি চমকপ্রদ কৃতিত্ব দূরকে নিকট করার অভিযান। সেখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী। ১৯২৭ সালে তিনি কবির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেই পরিক্রমার কথা 'দ্বীপময় ভারত' নামে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থখানি তাঁর অনন্য-সাধারণ রচনা। গ্রন্থখানি পর্যালোচনা করলে তার মধ্যে আমরা ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতির এক আশ্চর্য বিশ্লেষণ খুঁজে পাই।

ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হলেও সুনীতিকুমার ছিলেন মানবিকী বিদ্যার সর্ববিভাগেই দক্ষশিল্পী। তিনি কত গ্রন্থ লিখে গেছেন।

তাঁর 'অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' সব চেয়ে বিশ্রুত কীর্তি। সমাজ, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর রচনা আছে। তাঁর আজীবন জ্ঞান চর্চারই এই সমস্ত সুচিন্তার ফসল।

একটানা আটত্রিশ বৎসর সুনীতিকুমার কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'খয়রা' অধ্যাপক পদে ছিলেন। তারপর হন এমারিটাস অধ্যাপক।

১৯৬৬ সালে জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন সুনীতিকুমার। তারপর ১৯৬৯ সাল থেকে সাহিত্য অ্যাকাদেমির সভাপতি ছিলেন তিনি।

জাতীয় মর্যাদা অনেকেই লাভ করেছেন। লাভ করেছেন সুনীতিকুমারও। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে আবার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিও তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকালীন আর কেউ কি স্বদেশে কি বিদেশে তাঁর মতো এমন কিংবদন্তী সমান সম্মান পেয়েছিলেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সুনীতিকুমার ছিলেন একদিকে খাঁটি ভারতীয় এবং খাঁটি বাঙ্গালী। অন্যদিকে তিনিই ছিলেন আবার বিশ্বপথিক। একই মানুষের পক্ষে কি ভাবে তা হয় সুনীতিকুমার নিজের জীবনে তাই দেখিয়ে গিয়েছেন।

সর্বশেষে এবং সর্বোপরি একটি কথাই বারবার মনে হচ্ছে, সেই সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডারী সুনীতিকুমার আজ আমাদের মাঝখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। জানি তিনি আর কখনও ফিরে আসবেন না। তবু তিনি চিরস্মরণীয়, চিরবরেণ্য, অবিনশ্বর, এই বাস্তব সত্য শুধু উপলব্ধির মাত্র।

—ভূপেন ভট্টাচার্য

'রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা মরা-মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল'—সু-সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কোন এক মহাপুরুষের জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। আজ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমারও ঐ একই কথা মনে পড়ছে। কারণ, ঐ নাম গ্রহণ করার আমার কোনরূপ অধিকার আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় উপস্থিত হবার সম্ভাবনা। কারণ, আচার্যদেব এত বড় এবং আমি এত ছোট যে তাঁর নামগ্রহণ আমার কাছে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পলাশী যুদ্ধের কিছুদিন আগে থেকে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করেছে, আচার্যের চরিত্র তার চেয়ে এত উচ্চে যে, তাঁকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠাবোধ জাগে। আমরা প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানে এত মৌখিকতার প্রভাব এবং সহৃদয়তার অভাব দেখিয়ে থাকি যে আজকের এই আলোচনাটাই একটা ভণ্ডামি নয়, তা প্রমাণ করা খুবই দুষ্কর।

কিছুদিন আগে অনেকক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল। দেখে মনে হ'ল বিষণ্ণতার মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন। প্রশ্ন করলাম—'কেমন আছেন'? মুখে হাসির রেখা টেনে বললেন—'বার্ধক্য এসে দোর গোড়ায় অপেক্ষা করছে। আর কি ভাল থাকতে পারি'?

উনি বয়সকালের এই বার্ধক্যকেও অকালবার্ধক্য বলে মনে করেছিলেন। উনি প্রায়ই বলতেন—'কত কাজ বাকি রয়ে গেল, কত ভাল ভাল বই এখনও পড়াশুনার বাকি আছে'। উনি কিছুতেই এই অবস্থাকে সম্ভাষণ জানাতে পারছিলেন না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অন্ততঃ আর একখানা বই তাঁকে লিখতেই হবে। না হলে পরকালে গিয়ে তিনি শান্তি পাবেন না। রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরঋণী থেকে যাবেন।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন, 'জানো আমার আয়ু আর বেশীদিন নেই।' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম কি করে বুঝলেন? আপনি নিজের ভাগ্য নিজেই গণনা করেছেন নাকি?

'না তা নয়, তবে ঠিকুজীতে আছে সাতাশী বছর বয়সে বিদেশে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা।' তাই আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে বিদেশে ছানি কাটাতে দিতে চাইলে না। কলকাতাতেই অপারেশান হলো। ভালোভাবে অপারেশান শেষে বাড়ীতেও ফিরে এসেছেন তিনি। এখনও চশমা দেওয়া হয়নি। পড়াশুনা একেবারে বন্ধ। শুধু গল্প আর গল্প নিয়ে কাটাতে হবে কয়েক দিন। গল্প করেই কাটাতে হবে সময়।

কিন্তু হায়, সময় কাটানোর সমস্যার সমাধান করে দিল আকস্মিক মৃত্যু।

পরিণত বয়সে প্রয়াণকে অকাল মৃত্যু বলা চলে না। সাতাশি বছর বয়সে সুনীতিকুমারের মৃত্যুকেও তাই অকাল মৃত্যু বলছি না। কারণ, গড়পড়তা আয়ুর হিসাবে তাঁকে দীর্ঘায়ু বলেই ধারণা করা যায়।

কিন্তু একটু অন্যভাবে চিন্তা করলে বলা যেতে পারে যে তিনি তো গড়পড়তা মানুষ ছিলেন না, ছিলেন গড়ের বাহিরে এবং অনেক উপরে।

তাই সুনীতিকুমারের মৃত্যুতে জাতীয় জীবনে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল। সাতাশিতে পা দিয়েও তিনি দেহে এবং মনে ছিলেন সক্ষম, মেধায় সক্রিয় এবং জাগ্রত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর অধ্যয়ন ও নব নব উদ্ভাবনের ফল উপহার দিতেছিলেন। রামায়ণ সম্পর্কে তাঁর চাঞ্চল্যকর চিন্তাধারা আমাদের সেদিনও চমকিত করেছে। শুধু নাই নয়, এই গুরুদেবের সংখ্যাহীন সুযোগ্য ছাত্র সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং গুরুদেবের জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তাদের হাতে হাতে অগ্রসর হয়ে যাবে। কিন্তু তবুও

আমাদের শোকে নিমজ্জিত হতে হবে। কারণ, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের আরও একটি সেতু লুপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে এই শতাব্দীর অবশিষ্ট গ্রন্থগুলিরও একটি ছিন্ন হ'ল। আচার্যদেব শুধু অগ্রগণ্য কোন পণ্ডিতই যে ছিলেন তা নয়; তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। ইংরাজীতে যাকে Institution বলে। তিনি পরলোকে লোকান্তরিত হওয়ায় দেশ ও জাতি উভয়ই দরিদ্র হ'ল।

সুনীতিকুমার ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক। আমাদের দেশে ভাষাতাত্ত্বিক তো কতই। অনেকে ছিলেন, অনেকে আছেন। আর আমাদের ভাষা যদি আবাহমানকাল ধরে চলতে থাকে তা'হলে আরও অনেক ভাষাতাত্ত্বিকের আবির্ভাবও হয়ত ঘটবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলতে যেমন একজনকেই বুঝায়, তেমনি ভাষাচার্য বলতে এক এবং অনন্য সুনীতিকুমারকেই বুঝাবে।

সুনীতিকুমার জাতীয় অধ্যাপকের সম্মানও লাভ করেছেন। লাভ করেছেন সাহিত্য অ্যাকাডেমীর শিরোমণিরূপে বরণ, পদ্মবিভূষণ উপাধি। কিন্তু তিনি নিজে এত উদ্ভাসিত যে, কোন সম্মানই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারেনি।

আচার্যদেব ভাষা কমিশনের প্রধান থাকাকালীন জোর করে হিন্দী ভাষা চালানোর প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচিত 'অরিজন অ্যানড ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' বিশ্রুত কীর্তি।

অসাধারণ মানবতা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনীতিতেও তাঁর মনের ঔদার্যতার পরিচয় মিলেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে তাঁর অসামান্য নিবন্ধ নিবেদন স্মর্তব্য। দূরকে নিকট করার অভিযানই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। "দ্বীপময় ভারত"-এর সঙ্গে মূল ভারতকে তিনিই পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন।

ভাষাতত্ত্বকে বিশ্ববিদ্যায়তনে প্রাপ্য সম্মান দান করেন সুনীতিকুমার। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'আপনি এত ভাষা

শিখলেন কি করে? আর এত বই পড়ে কি করে মনে রাখছেন এবং শরীর সুস্থ রাখছেন?'

উত্তরে উনি বললেন—'বিশ্বাস করুন, আপনারা যা ভাবছেন আমি তা নই, কিছুই জানি না। যৌবনে কিভাবে যে কয়েকটা সূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম, তার ফলে কয়েকটা ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারি। কারণ সব ভাষাব মূল সূত্রের মধ্যে একটা ঐক্য আছে।'

আচার্যদেব ছিলেন জীবনবিলাসী। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ বই-এর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার। তিনি সারাজীবন শুধু এতেই আবদ্ধ থাকেন নি, গান, বাজনা, থিয়েটার, ছবি আঁকা, এমন কি পেট ভরে খাওয়া সবই তাঁর ভালো লাগত। আর ভালোবাসতেন মানুষকে। তাঁর কোন শত্রু আছে, এটা কখনোই তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর লেখা শেষ বই 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস।'

সুনীতিকুমার আজীবন অঋণী ছিলেন। এই কথাটির প্রমাণ হিসাবে লেখকের জবানবন্দী হাজির করছি। পঁচাত্তরের ফেব্রুয়ারী মাসে লেখক ও একজন প্রবীণ কবি কয়েকটা দিনের জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন। সুনীতিকুমারও সেই সময়ে দিল্লী গিয়েছিলেন নিজের কাজে। ওঁরা সবাই বঙ্গভবনে উঠেছিলেন। প্রত্যেককে একসঙ্গে সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ডাইনিংরুমে গিয়ে খেতে হত বলে, প্রত্যেকের তিনবার করে দেখা হ'ত। সুনীতিকুমার ঐ সময় সবাইকে মজার মজার গল্পের মাধ্যমে মাতিয়ে রাখতেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর গল্প শুনতেন। এই সময় হঠাৎ একদিন সকালে খবরের কাগজে একটি বিদেশী পুরস্কারের কথা বার হয়। খবরের কাগজটিতে সব কথাই ছিল কিন্তু সুনীতিকুমার যে সেই পুরস্কার কমিটির একজন বিচারক সে কথা ছিল না। পূর্ব উল্লিখিত লেখক ভ্রমণে বেরিয়ে একটি কপি টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকা কেনেন এবং দেখেন যে তা'তে আচার্য দেবের নামোল্লেখ আছে। তিনি এই

একটি কাগজের কপি একজনের হাত দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু খানিক বাদে ডঃ সুনীতিকুমার তাঁর সঙ্গীকে দিয়ে পয়সা পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখে তো লেখক অপ্রস্তুতে পড়েছেন। তিনি বললেন যে, কাগজখানা তিনি তারই জন্য কিনেছিলেন। এই শুনে সঙ্গীটি ফিরে গেলেন। কিন্তু কিছু সময় পরে আবার সশব্দ করাঘাত শুনে লেখক দরজা খুলতেই দেখেন আচার্য দেব নিজেই এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলছেন, 'পয়সা আপনাকে নিতেই হবে। নয়তো কাগজখানা ফেরত নিতে হবে'।

লেখক বলেছিলেন, 'সামান্য কাগজ একটাতো' মূল্যবান জিনিষ কিছু নয়, তার দাম দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা না দেখালেই কি নয়?

উত্তরে সুনীতিবাবু বলেছিলেন, 'অঙ্কটা যা-ই হোক্, আমি কোন ঋণ রেখে যেতে চাই না'। এই ধরনের মানুষ ছিলেন সুনীতিকুমার।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর একস্থানে লিখেছেন—'অনুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, তাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়, বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ বিজ্ঞানে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহার হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ।' ঠিক তদ্রূপ সুনীতিকুমারের জীবন আলোচনাকালে তাঁকেও বিদ্যাসাগরের সত্যিকার উত্তরসূরী বলে মনে হয়। কারণ আমাদের দেশে অধুনা যাঁদের আমরা বড় বলিয়া মনে করি, এই সুনীতিকুমারের সৃষ্টিরাজি তাঁদের সামনে মেলে ধরলে, তারাও অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র হয়ে পড়েন।

যাহাই হউক, আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহ বশে আজ আমি সুনীতিকুমারের চরণোপ্রান্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সুযোগ পেয়েছি, তাঁদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হ'ব। আমাদের দেশে জীবন চরিত লেখা প্রচলিত নাই। এবং কোন ব্যক্তির জীবন চরিত

লিখতে প্রবৃত্ত হলেও তার উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না।

শৈশবকাল থেকেই আচার্যদেবের গুণাবলীর পরিচয় লাভ করে, কল্পনায় তাঁর অবয়ব মনের মধ্যে অংকিত করেছিলাম। তাঁর আকৃতি, পরিচ্ছদ এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মশাইদের নিকট যে সকল গল্প শুনতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে অন্তঃকরণ একটা সুনীতিকুমারের মূর্ত্তিগড়ে ফেলেছিল।

পরে শৈশবকালের কাল্পনিক সুনীতিকুমারের সঙ্গে প্রকৃত সুনীতকুমারের সাদৃশ্য দেখেছিলাম কিনা এক্ষণে সে কথা লেখার আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেদিন তাঁর মুখে শোনা কয়েকটি কথা আজ পর্যন্ত আমার কর্ণ-বিবরে ধ্বনিত হচ্ছে। আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচিত কণ্ঠস্বর বাংলা-দেশের যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর কর্ণরন্ধ্রে ধ্বনিত হয়েছে এবং হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়েছে, তাঁরা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্তৃক প্রেরিত হয়ে সংসারের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করবেন—আমাদের এই দুর্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আর্বিভাব সম্ভবপর হয়ে থাকে, তা'হলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না? কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করে দীপবর্তিকা আনয়ন করবে কে? কে বলবে আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতভূমিতে নূতন ঘটনা নয়। আশা যে, মহাপুরুষের আর্বিভাব ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সে মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থি অন্ধকারময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করবে কে?

সবশেষে এবং সর্বোপরি বলা দরকার যে এক সঙ্গে খাঁটি বাঙালি, ভারতীয় এবং বিশ্বপথিক কি করে হতে হয়, তা তাঁর জীবনে দেখিয়েছেন সুনীতিকুমার।

শিষ্যকুলও কৃতজ্ঞজাতির স্মরণে তিনি আজও আছেন এবং থাকিয়া গেলেন। তাই পূর্বগামী বহুবরেণ্য মহাজ্ঞানী মহাজনদের ন্যায় এই জ্ঞানতপস্বী চিরযুবা ও চিরজীবি। অবিনশ্বর, তাঁর মরণ নাই।

—বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়

জীবন মূল্য আয়ুতে নয়—কল্যাণপ্লুত কর্মে। কিন্তু কল্যাণপ্লুত কর্ম আরও দীর্ঘায়িত করার জন্য দীর্ঘ আয়ুর দরকার আছে বৈকি।

বুদ্ধদেব, বিদ্যাপতি, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, উইনস্টন চারচিল প্রমুখ বহু মহামানব ও মণীষীর কাছে তাঁদের মণীষা ও প্রজ্ঞা বিকাশের পথে সহায়ক হয়েছে তাঁদের দীর্ঘায়ু। আষাঢ়ের সূর্যের মত তাঁরা দীর্ঘসময় ধরে পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন।

আচার্য সুনীতিকুমার জীবনপথের সুদীর্ঘ পথিক। সাতাশি বছর বয়সেও তার মৃত্যু দুঃখবহ। কারণ এই পরিণত বয়সেও তিনি নিজের জীবনীশক্তির প্রাবল্যে জরাকে প্রতিহত করে রেখেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন কর্মক্ষম—তাঁর বিদ্বৎচর্চা এবং অন্তরঙ্গ ও পরিচিত নির্বিশেষে নিয়ত বিশ্রাম্ভালাপ কখনও থেমে থাকেনি। স্থবিরত্ব তাঁর পথপরিক্রমার অন্তরায় হয়নি। একদা রবীন্দ্রনাথ চিরতরুণ ও চিরনবীনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "চিরযুবা তুই যে চিরজীবী জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি"। কবি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন ৮৭ বছরের সুনীতিকুমারের মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত চির তরুণের ছবিটি প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

আমরা অনেকেই ভাগ্যবান, কারণ আমরা সুনীতিকুমারকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি ও বিভিন্ন সভায় তাঁর কথা শুনেছি। এই কলকাতা শহরের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সহজলভ্য। যে কোন সাধারণ সভাতেও তাঁকে দেখা যেত। ককটেল পার্টি থেকে সামাজিক অনুষ্ঠানে সর্বত্র তাঁর গতিবিধি ছিল অবাধ এবং সহজ।

কোথাও তার ভি. আই. পি. সুলভ ব্যস্ততা ছিল না। তাঁর পোষাকে দীনতা ছিল না কিন্তু তা বলে তিনি বিলাসীও ছিলেন না। একটিমাত্র ব্রাহ্মণসুলভ বিলাসে তিনি আসক্ত ছিলেন—সেটি হল ভোজনবিলাস। এখানেও তিনি পোশাকী আচারসর্বস্ব অভিজাত ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র—যারা পেটের খিদেকে মুখের লজ্জা দিয়ে ঢাকে, তিনি তাদের দলে ছিলেন না।

এক কথায় সুনীতিকুমার উনিশ শতকের উদারমনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শেষ প্রতিনিধি। সেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানী—যাঁরা জিজ্ঞাসু অথচ ভক্তিতে আপ্লুত নন। যিনি প্রতিগ্রহ করেন না, যাঁর জীবন চর্চায় অযথা আড়ম্বর নেই। শুধু কীটদষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে যিনি নিজেকে বিলীন করেন না—সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেন। যিনি যে কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হন অথচ আবদ্ধ হন না। সুনীতিবাবুর রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা অনেক সময় ছুঁৎমার্গীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে তিনি ভারত-চীন সংস্কৃতি সমিতির পুরোভাগে ছিলেন। এজন্য কট্টর চীন বিরোধীদের দ্বারা তিনি ধিকৃত হয়েছেন। তাঁর মত অ্যাকাডেমিশিয়ানের যে বিধান পরিষদের অধ্যক্ষের মত একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক পদে থাকা উচিত নয় একথা বহুজনের মুখে শুনেছি। কিন্তু সুনীতিবাবু কেন যে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে বিধান পরিষদে হাতুড়ি ঠোকার কাজ নিয়েছিলেন তা অনেকের কাছেই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু যাঁরা তাঁর চরিত্র জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন সামাজিক দায়দায়িত্ব বর্জিত শুষ্ক অ্যাকাডেমিশিয়ান হতে তিনি কখনও চাননি। বিধান পরিষদের অধ্যক্ষের কাজকে তিনি একটি পবিত্র সামাজিক কাজ বলেই মনে করতেন। তাঁর কার্যকালের শেষ তিন বছর আমি নিয়মিত বিধান পরিষদ কভার করেছি। সে সময় খুব কম দিনই তাঁকে অনুপস্থিত হতে দেখেছি। মনে পড়ে, তিনি মাঝে মাঝে এক একটি রুলিং দেবার সময় নানান

সরস প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। একবার বিধান পরিষদে তাঁর ঘরে একটি বিষয়ের অর্থ জানবার জন্য যেতেই তিনি বিষয়ান্তরে চলে গিয়েছিলেন। চীনের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে শব্দ ও ধ্বনিগত প্রভেদ কতখানি এবং একই চীনাভাষা যে প্রদেশভেদে বোধগম্য নয় তা প্রথম তাঁর কাছ থেকেই শুনি।

ব্রজেন শীল বা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মত সুনীতিকুমারের জ্ঞান ছিল এনসাইক্লোপিডিক। বিশেষ করে ভাষাতত্ত্বের আওতায় একবার কোন বিষয়কে নিয়ে আসতে পারলে আর তাঁকে পায়কে। ওই দুরূহ এবং দুরতিক্রম্য শুষ্ক বিষয়ের ওপর তাঁর বিদ্বৎ বিচরণ তো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে কোন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও শব্দার্থ জানবার প্রয়োজন হলে আমরা নির্দ্বিধায় ফোন করতাম তাঁকে। মনে আছে চাকরি জীবনের প্রথম দিকে যখন আমার মূর্খতার পরিধি আরও ব্যাপকতর ছিল তখন একবার তাকে ফোন করেছিলাম এটা জানতে—পানি শব্দটি কি সংস্কৃত? উনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। জল অর্থেও কি সংস্কৃত? উনি বললেন: হ্যাঁ। তা'হলে মুসলমানেরা পানি বলে কেন? উনি তখন বোঝালেন উত্তর ভারতের মুসলমানেরা নিজেদের অজান্তে এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করেছে। উত্তর ভারতে হিন্দুরাও তো জলকে পানি বলে। এই ঐতিহাসিক সত্যটি যদি বাংলাদেশের মুসলমানেরা বুঝতেন তা'হলে বি বি সি বাংলা বিচিত্রায় 'পানি' নিয়ে হাস্যকর জেদাজেদি চলত না। আর একবার কনস্যুলেটের একটা পার্টিতে তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলাম কোন একটি বাংলা দৈনিকের 'বানান সংস্কার' সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, 'মড়ার মোচ কেটে তার ভার কমানো।' সুনীতিবাবু বাংলা বানানে যত্রতত্র দ্বিত্ব বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি বিদ্বযুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এবং নিছক অ্যাকাডেমিক লেখায় তাঁর নামের সঙ্গে নিছক 'পান' করার লোভে

'সুনীতি না কুনীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। অনেক সাংবাদিকের এই অশোভন আক্রমণে তিনি যে ব্যথিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পেয়েছিলাম বহুকাল পরে—বাংলা বানানে সমতা ও গণজ্ঞাপনে ব্যবহারের উপযোগী সর্বজনগ্রাহ্য এক পরিভাষা রচনার ব্যাপারে একটি গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। এই সেমিনারের উদ্বোধনের জন্য আচার্য সুনীতিকুমারকে ফোন করতেই তিনি বলেছিলেন: 'ক্ষমা করবেন, বানান সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চান, আপনি আমার বাড়ি আসুন। আপনাকে আমি দু'ঘণ্টা সময় দেব। কিন্তু দোহাই এ সম্পর্কে কোন সভা-সমিতিতে আমাকে বক্তব্য পেশ করতে বলবেন না।'

সুনীতিকুমারের বাচনভংগিতে স্টাইলের অভাব ছিল কিন্তু তাতে কাপট্যের লেশমাত্র ছিল না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে মিশেছেন তারা জানেন, তিনি স্পষ্টভাষী ছিলেন এবং অপ্রিয় সত্য বলতে কার্পণ্য করতেন না। তাঁর কথায় ধার ছিল না কিন্তু ভার ছিল। এই ভাবের গুণে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনত। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা তা তাঁর বক্তৃতার প্রধান প্রাণ ছিল। অথচ আশ্চর্য তাঁর দীর্ঘ ভাষণে যে কখনও ক্লান্তি বোধ করিনি তার একটা কারণ তার প্রতিটি কথাই এক একটি নতুন নতুন তথ্য। মনে আছে সাহিত্য আকাদমি আয়োজিত সুকুমার রায় স্মরণে কিছুকাল আগেকার সভাটির কথা। এটাই তার শেষ সভা যাতে আমি উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। ওই সভায় এক ঘণ্টার মত স্মৃতিচারণ করেছিলেন তিনি এবং নিজের জীবনের বহু সরস কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন। এক সময় তিনি মূল বিষয় থেকে এতখানি সরে গিয়েছিলেন যে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছিলেন সুকুমার রায়-এর কথা তুলুন। অনেকের আশংকা ছিল হয়ত এই বিস্তৃত জালকে তিনি টেনে তুলতে পারবেন

না। কিন্তু পারলেন। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বিশ্ব-পরিক্রমা শেষ করে তিনি মূল বক্তব্যে ফিরে এলেন। এখানেই সুনীতিকুমারের বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে এক সর্বব্যাপী মন ছিল। তিনি বিষয়ে আবদ্ধ থাকেননি। দ্বীপময় ভারত থেকে ইউরোপ, আমেরিকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি দার্শনিক অথচ ঘোরতর গৃহী ( এক পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক )। তিনি জ্ঞানতাপস, আবার অতি সামাজিক। মানুষের সান্নিধ্য তিনি ভালবাসতেন। আমি কোনদিন তাঁর বাড়িতে যাইনি কিন্তু যাঁরা গেছেন তাঁদের কাছে শুনেছি সকলের জন্য তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। তাঁর এই ঢিলেঢালা সামাজিক জীবন অনেকের মনেই সন্দেহ জাগিয়েছিলেন ও ডি বি এল-এর পর জ্ঞানের জগতে তাঁর আর কোন মৌলিক অবদান আছে কিনা। কেউ কেউ বলতেন তিনি শুধু একটি 'মিথ' হয়ে বেঁচে আছেন। পূর্ব গৌরবের ভিতের ওপর তার বর্তমান সমৃদ্ধির ইমারত উঠেছে।

একদা আমি এই প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি তখন জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর ঘরে বসে। আমাকে দেখিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্ণালে তাঁর কি কি প্রকাশিত হয়েছে বা হতে চলেছে। আমি লজ্জিত হয়ে চলে এসেছিলাম। দোষ আমার নয়। মাসমিডিয়ার যুগে সবচেয়ে বড় অভিশাপ জনসাধারণের নিজস্ব বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের লোপ। জনসাধারণ এক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণের জন্য মাসমিডিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এবং খবরের কাগজ টিভি বা রেডিওতে যাদের নিরলস বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কাহিনী ফলাও করে বার হয় না চিরকাল তাঁরা জনসাধারণের চোখের আড়ালে থেকে যান। সুতরাং সুনীতিকুমার যতক্ষণ পপুলার ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আবার না লেখালেখি সুরু করেছেন ( উদাহরণ রামায়ণ ) এবং যতক্ষণ না তার বিষয় সংবাদপত্রে উল্লিখিত হতে সুরু হয়েছে ( সংক্ষিপ্ত বিবাহ বিধি রচনা ) ততক্ষণ সাধারণ লোকে ভেবেছেন সুনীতিকুমারের কাজ

এখন শুধু সভা-সমিতির শোভা বর্দ্ধন। আমি তাঁর ছাত্রদের অনুরোধ করব তাঁর সমস্ত রচনাবলীর একটি বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ করা হোক।

সমস্ত দিক দিয়েই সুনীতিকুমার উনিশ শতকের বাঙালী মনীষীদের শেষ প্রতিনিধি। তাঁর জন্ম ওই শতকের একেবারে শেষ দশকে ( ১৮৯০, ২৬ নভেম্বর )।

এযুগের অনেকের মতই তিনি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আপন প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের জোরে কৃতি হয়েছিলেন। পিতা ও পিতামহ দু'জনেই ছিলেন কেরাণী। প্রথম পড়াশোনা মতিশীলের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে। হেঁটে স্কুলে যেতেন। সুনীতিকুমারের সঙ্গে সঙ্গে গত শতকের আর একটি ঘরাণার অবসান হল। সেটি হল তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। কে যেন বলেছিলেন, আমার স্মৃতিই আমার অভিশাপ। সুনীতিকুমার শুধু বহুভাষার উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তির কথাই যে মনে রাখতে পারতেন তা নয়, বহু মানুষের ব্যক্তিগত বংশ কুলজী, তাদের জীবনের ঘটনা এবং তাঁর নিজের জীবনের যে কোন দিনের ঘটনা হুবহু বলে যেতে পারতেন। তিনি যদি একটি বিস্তৃত স্মৃতিকথা লিখতেন তা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক বহুমূল্য দলিল হিসাবে পরিগণিত হত। এক কথায় তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। শোনা যায় ছোটবেলায় পিতামহের কাছে ফারসি বয়েৎ শুনে তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলেন।

সুনীতিকুমার নোয়াম চমসকির চেয়ে বড় দরের ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন কিনা এমন কি ভারতীয় ভাষতত্ত্ব চর্চায় জুলব্লক কলডওয়েল ও বীমসের তুলনায় সুনীতিকুমারের মৌলিক অবদান কতখানি এ সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে চুলচেরা তর্ক উঠতে পারে। এমনকি সেদিনও একজন বাঙ্গালী লেখক ও শিল্পী দুঃখ করছিলেন, সুনীতিকুমার দীর্ঘ আয়ু পেয়েও নিরত জ্ঞানান্বেষণে সময়কে ব্যবহার করেননি। কিন্তু যেহেতু আমি বিশেষজ্ঞ নই, সেহেতু এই বিতর্কে প্রবিষ্ট হতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সুনীতিকুমার

যদি গগনচুম্বী প্রাসাদ নাও গড়ে থাকেন তবে যে গৃহটি তিনি তৈরি করেছেন তার প্রতিটি ইটকাঠ মজবুত এবং ঘাতসহ। তার সর্বব্যাপী জ্ঞানতৃষ্ণাকে যেন পল্লবগ্রাহীতা বলে আমরা কেউ ভুল না করি। তিনি যেটুকু জানতেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত জানতেন। জ্ঞানের বিভিন্ন সমুদ্র থেকে তার মত ক'জন এত মণিমুক্তা তুলে আনতে পেরেছেন? প্রবণতা ছিল ইতিহাসের (আই. এ.-তে ইতিহাসে প্রথম) কিন্তু বি. এ.-তে অনার্স নেন ইংরাজিতে (১ম শ্রেণী)। ওই ইংরাজিতেই এম. এ. (১ম শ্রেণী)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরাজি ভাষা সাহিত্য ও জারমানিক ও ইংরাজি ভাষাতত্ত্ব ছিল তাঁর এম. এ-র বিষয়। ছত্রিশ বছর বয়সে 'ও ডি বি এল'-এর মত বই ক'জন ভারতীয় লিখতে পেরেছেন? সুনীতিবাবুকে বহুলোক বাংলার এম. এ. বলেই জানেন। এই যে তাঁর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে উত্তরণ তাঁর শিক্ষা জীবনেই এর প্রয়োগ আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ তো তাঁকে দিয়েই সুরু হয়। একথা ঠিক, ভারতীয় ভাষাচর্চার অগ্রণী ছিলেন ইউরোপীয়রা। তারা অগ্রণী, পথপ্রদর্শক। কিন্তু তাই বলে সেই পথ যদি কেউ বিস্তৃত করে যান এবং পায়েচলা পথকে জনপথে পরিণত করে যান তা'হলে তার গৌরবের পূর্ণ ভাগীদার করব না কেন? ডানকান জোনাথান, হেনরি ফরষ্টার, হ্যালহেড বাংলা চর্চায় পথিকৃৎ কিন্তু তা'বলে বাংলা গদ্যের বন্ধন মুক্তিতে রামমোহনের অবদান সীমিত হবে কেন? একথা অস্বীকার করা যায় কি করে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের কথা উঠলেই কথা ওঠে সুনীতিকুমারের। একদা যে তাঁর ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থখানি বুদ্ধিজীবীদের মর্যাদা বাড়াত তার প্রমাণ শিলং পাহাড়ে অমিত রের হাতে সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব। সুনীতি-কুমার ছাড়া কোন্ ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের জগতে এত আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন? ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেছেন ইউরোপে। ১৯২১ সালে লণ্ডন থেকে ডি. লিট. করেছেন। শিখেছেন ফোনেটিকস,

ইনডো ইওরোপীয়ান ভাষাতত্ত্ব, প্রাকৃত, ফারসি সাহিত্য, পুরনো আইরিশ, পুরনো ইংরাজি ও গাথক শিখেছেন। শিখেছেন স্লাভ, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ও অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাতত্ত্ব। বহুবার বহু আন্তর্জাতিক পণ্ডিতসভায় তিনি উপস্থিত থেকেছেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আমি বিদেশে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ্‌দের মুখে তাঁর সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ শুনেছি। একজন বাঙালী হিসাবে এর চেয়ে আর গর্বের কি হতে পারে?

যে কথা আগেই বলেছি সুনীতিকুমার ছিলেন একজন 'টোট্যাল ইনটেলেকচ্যুয়াল'—এক সামগ্রিক সংস্কৃতিমনা পুরুষ। সেই সঙ্গে তার মধ্যে ছিল দার্শনিকের জীবন জিজ্ঞাসা আর কবির রসানুভূতি। নীরব নিস্তব্ধরাতে তিনি আকাশের তারার দিকে চেয়ে চেয়ে কি খুঁজতেন? দুঃখ এই যে তাঁর এই মন্ময় ( Subjective ) হৃদয়টির পরিচয় কোন লেখায় পাই না। তাঁর অধিকাংশ লেখাই বস্তুনিষ্ঠ। তাঁর জীবনে গভীর আধ্যাত্ম চিন্তার কোন পরিচয় পাই না। কিন্তু অতীন্দ্রীয় লোকাতীত ও অবাঙমানসগোচর মহাশক্তির ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে তার হাতে লেখা যে কবিতাটি চেয়ে নিয়ে তিনি শোবার ঘরে সযত্নে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছিলেন; প্রশ্ন জাগে এত কবিতা থাকতে এই কবিতাটি কেন?

'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি
বিশ্ববিহীন বিরূপে বসিয়া
বরণ করি
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।'

আসলে বাইরের আপাত কঠোর নিস্পৃহ নিরাসক্ত জীবনবোধের অন্তরালে সুনীতিকুমারের মন একটি বিশ্বাসের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। অজাতশত্রু, মানবতাবাদী, জ্ঞানতপস্বী নিজেকে অবাঙ-

মানসগোচর নিত্য লীলাময় জীবন দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

অকস্মাৎ মৃত্যু এসে তাকে হরণ করে নিয়ে গেল। রোগজর্জরিত, জরাগ্রস্ত কোন বৃদ্ধকে নয়—মৃত্যু নিয়ে গেল স্বাস্থ্যবান ৮৭ বছরের এক চির তরুণকে। পুরু চশমার কাচের আড়াল দিয়ে যাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঔজ্জ্বল্য হারায় নি। তিনি তো আকাংক্ষাই করে গেছেন, 'স্মৃতিবিভ্রম হয়ে অথর্ব হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ঢের ভাল। তবু জীবন মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর কীর্তিকে ফেলে তাঁর জীবনের রথ যে এগিয়ে গেছে এর জন্য আজ আর শোক নেই। কারণ তিনি বংশ পরম্পরায় বেঁচে থাকবেন তাঁর ছাত্রদের হৃদয়ে আর অনন্তকাল ধরে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে ততদিন।

তাঁর শ্রাদ্ধের যে আমন্ত্রণ লিপি পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম তার সন্তানদের কাছে, তাতে একটি কথা লেখা ছিল যা উদ্ধৃত করে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করছি ঃ

"তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ—একত্ব্ম অনুপশ্যতঃ।।" যেখানে মোহ কি, শোকই বা কি,—সমস্ত একত্ব অনুধাবন করলে।

—পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আচার্য সুনীতিকুমারের তিরোধানে শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশেরই মানবিকীবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি গৌরবময় যুগের প্রায় অবসান হল। প্রায় বলেছি এই জন্য যে সৌভাগ্যবশত মহা-মহোপাধ্যায় দত্তো বামন পোৎদার, আচার্য সিদ্ধেশ্বর বর্মা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, টি পি মীনাক্ষীসুন্দরন, হাসমুখ ধীরাজ সাংকলিয়া, দীনেশচন্দ্র সরকার এবং সুনীতিকুমারেরই শিষ্যোত্তম সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, মুহম্মদ এনামুল হক

প্রমুখ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁদের অনেকেই এখনো রীতিমত সক্রিয়।

আমরা যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র (১৯৩৮-৪০) তখন ঐ বিভাগ বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সমাবেশে ঝলমল করত। সুনীতিকুমার উজ্জ্বলতমদের মধ্যে ছিলেন। আরো আগেই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণমননশীলতা, বিশ্বতোমুখী প্রতিভা ও অলোকসামান্য মেধার জন্য একটি উপকথায় পরিণত হয়েছিলেন। যে সমস্ত মনীষীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একমাত্র দর্শনাচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহা ছাড়া আর কারুরই এমন বিস্ময়কর প্রতিভা দেখিনি।

বহু শাস্ত্রে সম-পারদর্শী হয়েও সুনীতিকুমার নিজের সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন যে তিনি "has not been a professed student of philosophy or Religion, Anthropology or Sociology, and the subject he has professed all his life has been Linguistics, and Art has been his great passion in life." বিনয়োক্তি সন্দেহ নেই। তবু দেশে-বিদেশে তিনি প্রধানত বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক রূপেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন বলে আমরা ঐ দিক নিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা করব।

শব্দশাস্ত্রের জন্মভূমি আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। প্রায় তিন হাজার বছর আগেই বেদের শুদ্ধ আবৃত্তি, সংরক্ষণ ও অর্থবোধের জন্য ধ্বনিশাস্ত্র ও ব্যাকরণের চর্চা শুরু হয়। এই চর্চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পাই বিভিন্ন বৈদিক সংহিতার প্রাতিশাখ্যগুলিতে, যাস্কের নিরুক্তে এবং সর্বোপরি পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীতে। এগুলি সবই বর্ণনাত্মক (descriptive)। ঐতিহাসিক ব্যাকরণের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় চণ্ড ও বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণে। কিন্তু

result of a happy combination of proficiency and facts and familiarity with theory, and exhibits a mastery of detail controlled and ordered by the sobriety of true scholarship." দীপস্তম্ভের মতো এই গ্রন্থটি অচিরেই বহু তরুণ গবেষককে তার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা দিয়ে পথ প্রদর্শন করেছে এবং মূলত এর অনুসরণে অসমীয়া, অবধী, কোংকনী, গুজরাটি, ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু নূতন পদ্ধতি—প্রাগ (Prague) পরিষদের দ্বিকালিক ধ্বনিতত্ত্ব (Diacromic Phonology), আমেরিকার সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান (Structural Linguistics), এবং হালের রূপান্তরশীল সংজনক ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar) প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ODBL-এর মূল্য ও উপযোগিতা এতটুকু কমেনি। বস্তুত, আমার যতটুকু জানা আছে নবীন পদ্ধতিতে এখন পর্যন্ত মাত্র দুটি ভারতীয় আর্যভাষার (সিংহলী ও হিন্দী) ঐতিহাসিক ব্যাকরণ লিখিত হয়েছে (কিন্তু প্রকাশিত হয়নি); তাদের মধ্যে সিংহলী গবেষক ডক্টর শ্রীমান করুণাতিলককে সুনীতিকুমারের প্রশিষ্য বলা যেতে পারে।

ODBL-এর একটি পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ অংশ হল সুদীর্ঘ ভূমিকাটি। এই অংশে সুনীতিকুমার কেবল যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে শুরু করে ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রচলিত সমস্ত নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ক্রমবিকাশের বিহঙ্গমাবলোকন করেছেন তা নয়, গবেষণার পরিধি অনেক বিকৃত করে সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ও ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্তরে ও পশ্চাৎপটে আর্যেতর জাতি ও ভাষার যে প্রভাব রয়েছে তার বিশদ আলোচনা করেছেন সিংহাবলোকনে।

পরবর্তীকালে বহু প্রবন্ধে ও গ্রন্থে অস্ট্রীক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোট-চীনীয়—প্রধানত এই চারটি জাতির পরস্পর মেলামেশায়, সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে যে একটি ঐক্যবদ্ধ, নিবিড় ও সুসংহত ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় জাতি-মানস, ভারতীয় ভাববোধ, ধ্যানধারণা ও জীবনধারা গড়ে উঠেছে তার আরো সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে তাঁর আহমেদাবাদে অখিল ভারতীয় প্রাচ্য-বিদ্যা সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালা Indianism and the Indian Synthesis, the Vedic age বইটিতে লেখা অধ্যায় Race-Movements and Prehistoric culture, Kirata-jana-kriti ও Dravidian নামক পুস্তিকা দুটি, এবং The National flag, Indian Culture, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা, ভারত সংস্কৃতি রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India' বইটির ২য় সংস্করণের প্রথম খণ্ডে ও অন্যান্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংকলিত প্রবন্ধাবলীর কথা।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি সমস্যার সমাধান তিনি করেছেন ODBL গ্রন্থে। প্রথমে হোর্নলে এবং তাঁকে অনুসরণ করে গ্রীয়র্সন নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলিকে অন্তরঙ্গ ( Inner ) ও বহিরঙ্গ ( Outer ) এই দুই গুচ্ছে বা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যদিও আর্যরা অন্তত দুটি প্রধান তরঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন ( অতি সাম্প্রতিককালে Zanotti নামে জনৈক পুরা-তাত্ত্বিক মনে করেন প্রথম ও শেষ তরঙ্গের মধ্যে প্রায় হাজার বছরের ব্যবধান ছিল ) এবং তাদের মধ্যে একাধিক উপভাষাও প্রচলিত ছিল তবু ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক বিচার করে সুনীতিকুমার প্রমাণ করেন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিভাগটি সমীচীন নয়। বর্তমানে সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিকগণ তাঁর এই মত মেনে নিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন ভাষার নানা ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা—ধ্বনিতত্ত্ব ও উচ্চারণ, নিরুক্তি বা নির্বচন, রূপতত্ত্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি শতাধিক প্রবন্ধ এবং কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তার সামান্য কয়েকটি নিয়ে ছোটখাট আলোচনা করাই সম্ভব। নিদর্শনসহ সাধু, কথ্য বাংলার উচ্চারণ নিয়ে লেখা A Bengali Phonetic Reader একটি প্রামাণিক পুস্তিকা। তবে ওখানে সাধু বাংলার ধ্বনিম ( Phoneme ) তিনি যে-ভাবে দিয়েছেন এখন তার কিছু সংস্কার বা পরিমার্জনা করা যেতে পারে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল A Brief Sketch of Bengali Phonetics, Recursives in New Indo-Aryan, Phonetic Transcriptions in the Historical and Comparative Study of Indian Languages, the Pronunciation of Sanskrit, মহাপ্রাণবর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাগুলিতে ঘোষবৎ ধ্বনিগুলির উচ্চারণ সম্পর্কে তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন অনেকেই তা মানতে রাজী নন।

সমস্ত নব্যভারতীয় আর্যভাষায়ই দুটি বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রায় সমার্থক দুটি শব্দ নিয়ে সমাস তৈরী করার একটা প্রবণতা দেখা যায় ( যেমন বাংলায় ধন-দৌলত, চা-খড়ি, শাক-সবজি, বাকস-পেটারা )। Polygottism in Indo-Aryan প্রবন্ধে সুনীতিকুমারই প্রথম দেখান যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতেও অনুরূপ ব্যাপার অজ্ঞাত ছিল না।

সমস্ত নব্যভারতীয় আর্যভাষাতেই দুটি বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রায় সমার্থক দুটি তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন ও আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতে যে আর্যেতর ( দ্রাবিড়, অস্ট্রীক, ভোট-চীনীয় ) ভাষার অসংখ্য শব্দ রয়েছে তা অনেক আগেই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন। সুনীতিকুমার এই তালিকায় আরো অনেক শব্দ সংযোজন করেছেন, যথা—অঙ্গার, কপাল, কপোল, গঙ্গা, গণ্ডক, চাউল, চিড়িয়া, জংঘা, ঝাড়, ঝোপ, তণ্ডুল, তসর, পণ (=৮০) পুষ্প,

পূজা, বাছুর, ভেক, মসার/মুসার (=মরকত মণি) শার্দুল, সিন্দুর ইত্যাদি। এদের কোন-কোনটা নিয়ে এখনো সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ আছে (যথা, অঙ্গার, তণ্ডুল, তসর, পুষ্প, পূজা), কিন্তু বেশীর ভাগই যে সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় আর্যভাষায় আগন্তুক শব্দ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমস্ত ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে হিন্দীর একটা সরল রূপ পিজিন (Pidgin)—এমনকি হয়ত বা ক্রেওল (Creole)—হিসেবে সারা দেশে চলতি রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। কলকাতায় প্রচলিত এই "বাজার হিন্দী"-র একটি খসড়া তিনি দেন ৪৫।৪৬ বছর আগে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে (Calcutta Hindustani—A study of a Jargon Dialect)। এর পর এতদিন এ বিষয়ে আর কেউ কোন কাজ করেননি। সুখের বিষয় সম্প্রতি একজন বাঙালী গবেষক এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছেন সুনীতিকুমারের প্রবন্ধকে মূল আদর্শ রেখে।

তুর্কী বা তুরস্কদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যে মাত্র মধ্যযুগেই হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তির ভেতর দিয়ে তা নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ইন্দো-য়ুরোপীয়দের সঙ্গেও আদিম তুরস্কদের পরিচয় হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক খুঁটিনাটির মধ্যে ততটা না গিয়ে সর্বসাধারণের জন্য এই তথ্যটি সুনীতিকুমার আলোচনা করেছেন Hindus and Turks from Prehistoric Times প্রবন্ধে।

দুটি প্রাচীন ইন্দো-য়ুরোপীয়—ভারতের আর্য ও য়ুরোপের বাল্‌টিক—জাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের ঐক্য দেখিয়েছেন পরিণত বয়সের সুলিখিত, তথ্যনিষ্ঠ Balts and Aryans বইটিতে।

ODBL-এর পর সুনীতিকুমারের যে-কয়টি বই বিশেষ খ্যাতি-লাভ করেছে তাদের মধ্যে Indo-Aryan and Hindi ও Languages and Literatures of Modern India অন্যতম। প্রথমোক্ত বইটির গুজরাটি ও হিন্দী অনুবাদ অনেক আগেই প্রকাশিত

হয়েছে। বাংলায়, দুঃখের বিষয়, এখনো হয়নি। দ্বিতীয়টিতে অতি সরল ভাবে ও ভাষায় ভারতের আর্য এবং দ্রাবিড় ভাষা ও সাহিত্যের সুন্দর আলোচনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ অবিশেষজ্ঞ সকলের জন্যই। বইটির সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়।

প্রধানত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য লেখা হলেও "ভাষা প্রবেশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"-এর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে আমাদের দেশে আধুনিককালে ব্যাকরণ-চর্চার ইতিহাসে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে খাঁটি বাংলার ব্যাকরণ লেখার যে শুভারম্ভ রাজা রামমোহন রায় করেছিলেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায়, তারই পরিপূর্তি হল প্রায় একশ' বছর পরে সুনীতিকুমারের লেখনীতে।

ভারতের ভাষা ও লিপি-সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনায় তিনি নিজের নির্ভীক মতামত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অনেকেরই তা মনঃপূত হয়নি। কিন্তু সস্তা জনপ্রিয়তার লোভ অথবা মিথ্যা স্বাজাত্যাভিমান তাঁর নির্মোহ সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি পথিকৃৎ। এর জন্য তিনি যে-সমস্ত পারিভাষিক শব্দ তৈরী করেছেন তার অনেকগুলিই এখন ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সমিতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু অনুমান হয় পরে কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ নিয়ে তাঁর মনে দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদের যখন তিনি সভাপতি ছিলেন তখনকার এক মজার ঘটনার কথা বলে নিজের তৈরী পারিভাষিক শব্দ নিয়ে নিজেই রসিকতা করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। অন্যান্য কিছু কিছু শব্দও বাংলায় তিনি প্রথম প্রচলন করেন। মারাঠীতে culture-এর প্রতিশব্দ 'সংস্কৃতি' শব্দটির কথা তিনিই প্রথম কবিগুরুকে জানান, এর পর থেকেই

শব্দটি বাংলায় প্রচলিত হয়। 'বাতাবরণ' শব্দটিও প্রথম তিনি প্রয়োগ করেন। কিন্তু dinner-এর প্রতিশব্দ 'সায়মাশ' এখনো তেমন জনপ্রিয় হয়নি। ঋগ্বেদের 'পথিকৃৎ' বাংলায় আমদানি করেন তিনিই।

দেশ-বিদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মনীষীদের নিয়ে বাংলায় লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন (জাতি-সংস্কৃতি-সাহিত্য, ভারত-সংস্কৃতি, বৈদেশিকী, বাংলার মনীষী), সুখের বিষয়, যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

অতীতের যা-কিছু ভাল ও গ্রহণীয় তার উপর শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ বজায় রেখেও নবীনের প্রতি বিমুখ তিনি ছিলেন না। ১৯৫৪ সালে পুণার ডেকান কলেজ গবেষণামন্দিরে নবীন পদ্ধতির ভাষাবিজ্ঞান শেখাবার ব্যবস্থা হলে প্রবীণ বয়সেও সুনীতিকুমার (এবং সুকুমার সেন) অধ্যাপনায় অগ্রণী হন। দশ-বারোটি Summer ও Winter School এবং পাঁচ-ছটি চর্চা-সত্রে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেকান কলেজে অনুষ্ঠিত প্রথম নিখিল ভারত ভাষাতাত্ত্বিক সম্মেলনে তাঁর সভাপতির অভি-ভাষণ একটি মূল্যবান দলিল। আমার একটি লেখায় (Dialects of Bangladesh—An Outline) কয়েকটা বাংলা ধ্বনিমের পূর্ব-বঙ্গীয় উচ্চারণের বর্ণনায় তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। Tagore and World Literature বইটিতে গ্রীক Aphrodite শব্দটির তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তারও দ্বিতীয় অংশটি সন্দেহের অতীত নয় বলে এক চিঠিতে লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়েই আমাকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন তার কিছুটা, এই প্রসঙ্গে তুলে দিচ্ছি :—"পূর্ববঙ্গের চ, জ উচ্চারণ লইয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে আলোচনা করিতেছেন তাহা এখন আমার এলাকার বাইরে,···বিজ্ঞান গতিশীল, নূতন জ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্ব সর্বদাই যুক্তিসহ হইলে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে।...গ্রীক dota dote ঠিকই দিয়াছেন। *do *de হইতে dite নহে। তবে dite-র ঠিক

ব্যাখ্যা জানি না। সংস্কৃতের A-diti, Diti-র সঙ্গে যোগ আছে হয়তো।" এমনি ছিল তাঁর বিনয় ও মনের ঔদার্য। কত তরুণ গবেষককে যে কতভাবে তিনি সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই।

—নীলমাধব সেন

ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-সভ্যতার একটা বিরাট অধ্যায় শেষ—শেষ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মজীবনের। বিশ্ব তথা দ্বীপময় ভারতের যোগসূত্র আজ ছিন্ন—ছিন্ন মানব জীবনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই—ইহজগতের দেনা-পাওনা শেষ করে তিনি অমরলোকে চলে গেছেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের প্রয়াণ যেন মর্ত্যধামের ইন্দ্রপতন, যেন ছন্দময় জীবনের ছন্দপতন। এক বিরাট প্রতিভা, পাণ্ডিত্যের অসাধারণ দীপ্তি, জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার এবং চিরন্তন শিল্পীমানসের অবসানে বঙ্গ সরস্বতীর আঙ্গিনা আজ শূন্য। ভারবতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার মহান কৃতিত্ব তিনিই সর্বপ্রথম অর্জন করেছিলেন। সুতরাং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার বাঙ্গালীর গর্ব ও বাংলার গৌরব। তা' ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অসংখ্য ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়, বিভিন্ন ভাষার গঠনরীতি এবং বিন্যাস পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরার সবচেয়ে বড় কীর্তি ভাষাচার্য সুনীতি-কুমারের। তিনি শুধু ভাষাতত্ত্ব নিয়েই গবেষণা করেননি—দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনাও করেছেন—গভীর মনীষা নিয়ে সেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। তা'ছাড়া কাব্য, সাহিত্য, নাটক, শিল্প-কলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের চর্চ্চায় তিনি গভীর নিষ্ঠা

প্রদর্শন করেছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান আচার্য—তাই সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতিও ছিল তাঁর একান্ত দরদ—এই মনো-ভাব নিয়ে তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দেশের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল।

সুনীতিকুমার হাওড়া জিলার শিবপুরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. ও এম. এ. উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অধ্যাপনা করার পর ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিলাতে গমন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফোনেটিকসে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হলেন, তারপর দেশে ফিরে এসে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক পদ গ্রহণ করলেন। জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন থেকে দেশের সেবা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫১ ও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রাম্যমান অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। তিনি ভারতীয় ভাষা কমিশনেরও সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আচার্য সুনীতিকুমার সংস্কৃত কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। এই বৎসরই তিনি সোভিয়েত একাডেমী অফ সায়েন্সের অতিথি মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য সুনীতিকুমারকে জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহিত্য আকাদেমীর সভাপতি এবং লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ফোনেটিক্স্ এশোসিয়েশনের সভাপতি নিযুক্ত

হন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আচার্য সুনীতিকুমার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কার্য পরিচালনা করেন। আইন বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান থাকাকালীন তিনি দেশের রাজনীতি ও জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এ'ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে জীবনের প্রথম থেকেই ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং এইদুটি সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি আসীন ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে তিনি সুদীর্ঘকাল এই সংস্থার সহিত যুক্ত ছিলেন। ছাত্রজীবন হতেই তিনি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে আচার্য সুনীতিকুমার বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের ইণ্টার ন্যাশনাল পার্লামেণ্ট ফ্যা লিঙ্গুইষ্টিকসের কার্যকরী সমিতির সদস্য। আচার্য সুনীতিকুমারের সারাজীবন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে দেশ ও জাতির সেবা করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের বহু সারস্বত সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করে গভীর মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দী ভাষার উৎকর্ষ সাধনে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের অবদান অপরিসীম এবং তাঁর কার্যের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

আচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মানসপুত্র। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ সমূহের ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্র স্নেহধন্য। মোটের পর একথা বলা যায় যে আচার্য সুনীতিকুমার আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এক বিরাট জ্ঞানতপস্বী। জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রে সমন্বয়সাধনকারী। আচার্য সুনীতিকুমারের ন্যায় সর্বগুণবিমণ্ডিত শিক্ষাগুরু সত্যিই এ জগতে বিরল। শেষজীবনে রামায়ণ সম্পর্কে

বিতর্ক মূলক আলোচনার সূত্রপাত তিনি করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণামূলক কার্যে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কিন্তু পূজার শেষ অর্ঘ্য আর নিবেদন করা হ'ল না—পরপারের ডাক এসে গেল। তাই অসমাপ্ত পূজার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন দেশের অগণিত তরুণ গবেষকদের উপর। ভবিষ্যতের কাছে রেখে গেলেন এক বিরাট প্রশ্ন ? সে প্রশ্নের জবাব মিলবে কিনা কে জানে ?

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে সঙ্গে দুই শতকের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল—বিচ্ছিন্ন হলাম আমরা দ্বীপময় ভারতের মানুষ বঙ্গমাতার এই মহান সন্তানের সঙ্গে। পাণ্ডিত্যের শেষ শিখা আজ নির্বাপিত। বাঙ্গালী আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে একান্ত রিক্ত।

ডঃ পরমানন্দ হালদার

মহাকালের অমোঘ নিয়মে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। চলমান এই জগতে সবকিছুই নূতন নূতন পথে এগিয়ে চলেছে। জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু—আবার জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু—এই ভাবে সৃষ্টির নিয়মে এগিয়ে চলেছে মানব জীবন। যত মূল্যবান জীবনই হোকনা কেন, কোন জীবনকেই এই পৃথিবীতে চিরকাল ধরে রাখা যায় না। তাই, মানুষের জন্মকে স্বীকার করে নিলে, মৃত্যুকেও স্বীকার না করে উপায় নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে মানুষের এই নশ্বর দেহের অবলুপ্তি ঘটলেও, মানুষের মঙ্গলের জন্য সমাজকে সত্যের আলোক দেখানোর জন্য মানুষের মহান কর্মময় জীবনের অবদান বিলুপ্ত হয় না।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নশ্বর দেহ আমাদের ছেড়ে বহুদূরে অনন্তলোকে যাত্রা করেছে কিন্তু তাঁর কীর্তি, তাঁর জীবন ব্যাপী সাধনার ফল চিরকাল এই পৃথিবীতে থাকবে, মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে এবং সত্যের আলোক দেখাবে। আচার্য সুনীতি

রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাল বাসতেন এবং এই সঙ্গীতের উপর তাঁর অনেকগুলি রসগ্রাহী আলোচনাও আছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যে নাট্য আন্দোলন এর প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে সুনীতিকুমারের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে সুনীতিকুমার খুববেশী আগ্রহী ছিলেন না। বোধ হয়, আধুনিক কালের কিছু কিছু লেখা তাঁর ভাল লাগত না। তবে এ বিষয়ে তাঁর কোন গোড়ামি ছিল না। বহু গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করে মতামতের জন্য সুনীতিকুমারের কাছে পাঠাতেন। তিনি সব রচনাই কিছু কিছু পড়তেন। কিন্তু যেটি তাঁর ভাল লাগত সেটি সম্পূর্ণ পাঠ করতেন। যাদের লেখার মধ্যে তিনি সম্ভাবনা দেখতেন বা তাঁর ভাল লাগত তাদের ডেকে তিনি অনুপ্রেরণা দিতেন।

একজন ভাষাবিদের যেটা প্রধান গুণ, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সে গুণটা সুনীতি কুমারের মধ্যে যেমন ছিল, এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর মুখ থেকে বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ শুনে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও অবাক হয়ে যেতেন। তিনি যখন গ্রীক ভাষায় মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্য থেকে আবৃত্তি করতেন তখন গ্রীকবাসীরাও অবাক না হয়ে পারত না। আবার, তাঁর মুখ থেকে 'কোরাণ' পাঠ শুনে মুসলমান অধ্যাপকরাও অবাক হয়ে যেতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বৈচিত্র্য দেখে তিনি আনন্দ পেতেন, গবেষণা করার প্রেরণা পেতেন। আবার ঐ সকল বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য রচনার সাধনা করতেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাই, তিনি প্রকৃত অর্থে বিশ্বপ্রেমিক।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভাষাচার্য্য (রবীন্দ্রনাথ নাথ প্রদত্ত সম্মান) দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান) ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৩৩ সালে রাজসাহী (বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট শহর) কলেজের হীরক জয়ন্তী উৎসবের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষাতত্ত্ব শাখার সভাপতি রূপে। কলেজের ছাত্র হিসেবে এই অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ইংরেজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার প্রভাব সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি'র অতিথি শালায় তাঁর আবাস কক্ষে আমাকে দেখা করতে বলেন। একজন ইণ্টার-মিডিয়েট শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে। সেই সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক সুনীতিকুমার আমার মনে সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিরাট আগ্রহের, ব'লতে পারা যায়, ভালবাসার সঞ্চার করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পড়ার সময় পঠিতব্য বিষয়ের অন্যতম হোমরের ইলিয়ড ও ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের পটভূমিকায় প্রাচীন গ্রীক ভাষায় তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্পর্কে আমার মনে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হয়। কারণ গ্রীক শব্দটি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য শব্দেরই সমার্থক ছিল! কিন্তু প্রথম দিনের ক্লাসেই ডঃ চ্যাটার্জ্জির মুখে গ্রীক হেক্সামিটারের আবৃত্তি ও গ্রীক ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক বিশ্লেষণ শুনেই আমার সে ভীতি অনেকাংশে দূর হ'য়ে যায়। কেবল পাঠের মাধ্যমেই কাব্যের মাধুর্য্য কতদূর হৃদয় স্পর্শী হতে পারে, তার প্রথম পরিচয় পেলুম, অধ্যাপকের মুখে গ্রীক কবিতার ধ্বনি সমন্বয়ের ব্যঞ্জনায়।

এরপর ছাত্র হিসেবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা রিসার্চ সহকারী এবং কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপেও শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে অবাক বিস্ময়ে

তাঁর মধ্যে দেখেছি এমন একজন শিক্ষাগুরুকে, যাঁর সান্নিধ্যে ও শিক্ষা পদ্ধতিতে পঙ্গু ছাত্রও কাল ক্রমে বিদ্যাগিরি লঙ্ঘনের পথ খুঁজে পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বনিতত্ত্বও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের পঠন পাঠন ও 'রিসার্চ' সম্বন্ধে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ কৃতিত্বে অনুপ্রাণিত হ'য়েই পরবর্তী সময়ে ভারতের অন্যান্য স্থানে এই শাখা বিস্তার লাভ করে। প্রখর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিরাট প্রতিভার অধিকারী সুনীতিকুমারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বনিতত্ত্ব ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিভাগের 'খয়রা' অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। লণ্ডন থেকে ডি. লিট. উপাধি নিয়ে ১৯২২ সালে ভারতে পদার্পণের আগেই তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়।

এখানেই শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রকৃত কর্মজীবন, যে জীবন আজ পর্য্যন্ত বহু বিচিত্র ধারায় দেশে দেশে দিকে দিকে বিরাট চরিতার্থতায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এই বহুধা বিস্তৃত জীবনের পরিচয় একটি ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। বর্ত্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। যাঁরা এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে জানতে উৎসুক, তাঁরা শ্রীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮ মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৯) সঙ্কলিত "Curriculun vitae of Dr. Suniti Kumar Chattrjee". এবং ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ মিসেস সুকুমারী ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত "A personal Study : a Contribution to Indian linguistics and to Cultural Studies in general of Dr. Suniti Kumar Chatrerjee" নামক লেখা দুটি প'ড়ে দেখতে পারেন।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় স্বদেশে ও বিদেশের বিদ্বৎ সমাজে বহু পরিচিত, সম্মানিত এবং ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যাদি বিষয়ে দেশ বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

১৯৬০ সালের জুলাই আগষ্ট মাসে ডঃ চট্টোপাধ্যায় মস্কোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চ বিংশতিতম আন্তর্জাতিক প্রাচ্য-বিদগণের মহাসম্মেলনে ভারত সরকারের প্রেরিত ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে "India and China—Ancient Culture Contacts—what India took from China" এবং "On the culture of Africa" নামক বহু প্রশংসিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সফরে তিনি বহির্মঙ্গোলিয়ার কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নেগাপতম থেকে সংগৃহীত সপ্তম শতাব্দীর ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি উলান বাটরের গন্দাম বুদ্ধ মন্দিরে মঙ্গোলীয় জনগণের জন্য উপহার দেন। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যিকগণের একটি সমাবেশে মস্কোতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ও ভারত সরকারের সহযোগিতায় দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত Institute of Russian Studies-এর প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিনিময়ের ভিত্তিতে ১৯৬৬ সালে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচীতে কায়রো, আদ্দিশ আবাবা, আথেন্স, বুখারেস্ট, প্যারী, লণ্ডন, প্রাগ, পূর্ব বার্লিন, মস্কো, রিগা প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। গত বৎসরেই সোভিয়েত কর্তৃক আমন্ত্রিত হ'য়ে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে তিনি জর্জিয়ার জাতীয় কবি শোথারুমথাভেলির অষ্ট-শততম জন্ম উৎসবে যোগদান ক'রে কবির 'Vephkhis Tqaosa-ine' ( ব্যাঘ্র চর্মাবৃত মানব ) নামক স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছিলুম একজন সজীব মানবকে, আর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানব সভ্যতার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ভাষাতাত্ত্বিককে, যাঁর সত্ত্বা নিয়োজিত রয়েছে মানব হৃদয়ের রহস্য সন্ধানে—তার চিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষার

বর্হিপ্রকাশে—বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতায়। তাই অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বহু বিস্তৃত দেশ বিদেশ ভ্রমণের পরেই তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রচনা করেছেন গ্রন্থ, প্রকাশ করেছেন প্রবন্ধ। মানুষের সঙ্গে এই নিবিড় সংযোগ ছাড়াতো ভাষাতাত্ত্বিকের সাধনা সম্পূর্ণ হয় না—কেবল শুষ্ক ব্যাকরণের পঠন পাঠনে।

কিছুদিন থেকে তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষা-বিজ্ঞান Historical and Comparative Study of languages এবং বিশেষ এক সম্প্রদায় কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত নিছক বর্ণনাত্মক আঙ্গিক বিশ্লেষণ মূলক ভাষাবিজ্ঞান Descriptive and structural linguistics সম্বন্ধে আমার মনে কিছুটা দ্বন্দ্ব ছিল—এই সুযোগে উপস্থাপিত করলুম গুরুর কাছে এই প্রসঙ্গ। ভাষাচার্য্য সাহিত্য বাচস্পতি শিক্ষাগুরু বিরক্তি-পূর্ণ রোষে বললেন, "ন্যাকামি" ( "হ্যাঁ, এই শব্দটাই ব্যবহার করতে হবে" ) আমি তিনটি বক্তৃতায় ঐ Descriptive and Structural বিশ্লেষণের এসব তত্ত্ব খণ্ডন করেছি। মানুষের মৃতদেহকে ব্যবচ্ছেদ করলে তার মনের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবন্ত মানুষের ভাষা তার মনোভাবের প্রকাশক।" তারপরেই বললেন "ভাষা বিজ্ঞান আমার জীবিকা, আর্ট আমার ব্যসন।"

আমি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যখন তাঁর ১৬ নম্বর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীতে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে যাই, তখনও দেখলুম, এই নভেম্বরে যিনি আশি বৎসরে পদার্পণ করলেন, তিনি বয়সের ভারে দেহে মনে নুয়ে পড়েন নি। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর ভাবময় বুদ্ধিদীপ্ত যে প্রখর ব্যক্তিত্ব সহানুভূতিসমৃদ্ধ বাক্যালাপে উদ্ভাসিত ছিল তা আজও, তেমনি আছে। সময় ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। আমার সাক্ষাৎকারের কিছু সময় পরেই তিনি যাবেন দিল্লীতে সীমান্ত গান্ধী বাদশাখাঁর নেহরু পুরস্কার কমিটির সভ্যরূপে। নিতান্ত একজন পুরাতন প্রিয় ছাত্র—তাই উপায় ছিলনা—নিয়ে গেলেন তাঁর তেতলার লাইব্রেরী ঘরে, যেখানে

অন্যূন কুড়ি হাজার গ্রন্থ এবং দেশ বিদেশের বহু মূল্যবান শিল্প সামগ্রী সংগৃহীত রয়েছে। টেনে টেনে এক একটা দেখাতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে তার বিবরণ, পটভূমিকার ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশদ ভাবে উল্লেখ করলেন। বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পী কৃষ্ণ হুব্বর-এর কন্যা একখানি ছোট্ট প্লেটে বিভিন্ন রং এর কারুকার্য্যে নৈপুণ্যের সমাবেশ দেখিয়েছেন। সেই প্লেটখানি বের করে বললেন "এটি দেখে আমার তৃতীয় রিপু জেগে উঠলো, তাই প্লেটখানি উপহার পেলুম।

ক্রমশঃ অভিভূত হচ্ছি এই প্রতিভার সান্নিধ্যে। অকস্মাৎ চোখে পড়ল একখানি মুদ্রিত পুস্তিকা। "In memorium—Kamala Devi, 1900- A husband's offering of Love and Respect—Suniti Kumar chatterjee,

এই পুস্তিকার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছে দেখে অধ্যাপক পুস্তিকাখানি আমাকে দিলেন, বললেন "পড়ে দেখো—এটি আমার মৃতা স্ত্রী সম্বন্ধে।" ডঃ চ্যাটার্জ্জীর জীবন সাধনায় তাঁর মহিয়সী পত্নীর কি বিরাট অবদান ছিল তা জেনে যুগপৎ আনন্দিত ও ব্যথিত হলুম। যে ভাবে, যে ভাষায় স্মারক গ্রন্থখানি তিনি আমাকে দিলেন, তার মাধুর্য্য ও তার মধ্যে প্রকাশিত সার্থক জ্ঞান-তপস্বীর যে পত্নী প্রেমের পরিচয় পেলুম, তা চিত্তের মণিকোঠায় সঞ্চয় করে রাখবার মতো।

অপূর্ব বিস্ময়কর এই অধ্যাপক! আবহাওয়াকে একটু ঘুরিয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম "বহুদিন পূর্বে সজনীদাস বাংলাদেশের কয়েক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি (তিনটি নাম আমার মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও নজরুল) সম্বন্ধে তৎকালে বিখ্যাত 'শনিবারের চিঠি'তে কাব্যাকারে প্রশস্তি ছেপেছিলেন। আপনার সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছিল আপনার মনে আছে কি?"

বিস্মিত উত্তর এল, "কৈ না?" আমি বললুম রবীন্দ্রনাথ ও

নজরুল সম্বন্ধে সবটা মনে আছে, আপনার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র—' বলেই আবৃত্তি করলুম :—

"কাহার প্রাসাদ বল নবীন "ব্যাবেল ."
বিদ্যাভরপুর—
তবু কার ভালো লাগে ছোলা চানাচুর।
গর্বমুক্ত মন—
মূর্খতম পার্শ্বিকেরে গ্রীক কোটেশান
নিঃসঙ্কোচে বলে যান—
সুরসিক, সহৃদয়, বুদ্ধি ক্ষুরধার—
সুবিখ্যাত অধ্যাপক সুনীতিকুমার।"

—শম্ভু চৌধুরী

৩১ মে সকাল আটটায় কিংবা তারও কিছু আগে যাঁরা তাকে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলেন হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি 'সুধর্মা'য়, তাঁরা দেখেছেন সারা বাড়ি বিপর্যস্ত। ড্রইং রুম এলোমেলো। বরফের শীতল শয্যায় শুয়ে আছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দেয়ালের দিকে তখন তাকাবার ফুরসৎ পাননি কেউই। তাকালে দেখতে পেতেন নক্ষত্রের সংকেত। অবিস্মরণীয় কিছু বাণী। তার মধ্যে দুটো বাণী ছিল সুনীতিকুমারের বড় প্রিয়। প্রথমটি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি হিব্রু উক্তি : 'এলোই লামা সাবাখ্থানি।' অর্থাৎ হে ঈশ্বর, প্রভু আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ।

কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় কি ভুগছিলেন সুনীতিকুমার? নাকি কোনো অতীন্দ্রিয়তার খোঁজ করছিলেন? এ প্রশ্নের এখন উত্তর দেওয়া কঠিন।

মাঝে মাঝে তিনি ছাদের ওপর চলে যেতেন নিশুতরাতে। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতেন। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা: 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী'।

এই ব্যাকুলতা, একটু অন্যভাবে, ছিল তাঁর আজীবন। সেটা জানতেন তাঁর সহধর্মিণী কমলাদেবী। মধ্য রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পেতেন, তিনি পাশে নেই। আলো জ্বালিয়ে কি যেন খুঁজছেন বইয়ের ভেতর। নিবিষ্ট-মনে স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্যের ছবি দেখছেন। কখনো কখনো ছবি আঁকতেন তিনি ট্র্যাডিশানাল পদ্ধতিতে।

দেয়ালের দ্বিতীয় লিখনটি টেরেন্সের নাটকের একটি প্যারা-ফ্রেজ: 'হোমো স্থম হুমানি নীল আ মে আলিয়েন্থম পুতো।'

টেরেনস অবশ্য এই লাইনটি সংগ্রহ করেছিলেন গ্রীক নাট্যকার মিনান্দারের রচনা থেকে। প্রাচীন গ্রীসে মিনান্দারের মূল প্যারা-ফ্রেজটি ছিল এই রকম: 'ওউদেইস এস্তি মোহ আল্লোত্রিয়স। অর্থাৎ আমি মানুষ। মানবীয় কোনো কিছুই আমার কাছে দূরের নয়।

মন্ত্রের মতো সুনীতিবাবু এই লাইনটি উচ্চারণ করতেন মাঝে মাঝে। তার সঙ্গে একাত্ম হতে চাইতেন। শোনা যায়, কার্ল মার্কসেরও প্রিয় লাইন ছিল এটি।

মাঝে মাঝে একা হয়ে যেতেন সুনীতিবাবু। ভেতরের নির্জনতায় অবগাহন করতে চাইতেন। তখন রেকর্ড প্লেয়ার শুনতেন, বেটোফেন কিংবা ইহুদী মেনুইন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা হেমন্তের গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত। শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। তখন যদি কেউ তাঁকে নিরস ভাষাতত্ত্বের ভেতরে ডেকে আনতে চাইতেন, মুখের ওপর শ্রাবণ-মেঘের ছায়া ঘনাত।

তখন মনে পড়ত তাঁর অতীতের দু-একটা ঘটনা। মনে পড়ত, এত্তেলা না দিয়েও সুনীতিকুমার ঠাকুর-বাড়িতে যেতে পারতেন যখন

তখন। সম্পর্ক সেরকমই ছিল। তবু যেতেন না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, তোমার আবার এত্তেলা দেবার দরকার কি! যখন খুশি আসবে. যাবে। তুমি আমার ঘরের মানুষ।

সুনীতিকুমার বলতেন, জানি, আপনি আমাকে ভালোবাসেন। আর ভালোবাসেন বলেই ভয় হয়, এই সুযোগে হয়তো আপনার কাজের ক্ষতি করে ফেলছি।

রবীন্দ্রনাথ হাসতেন সামান্য : একথাটা সবাই কিন্তু বোঝেন না।

মৃত্যুর পূর্ববর্তী এগারো দিন বাদ দিলে, সুনীতিবাবুর দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন ছিল না এক বছর। চোখে ছানি পড়েছিল। তখন গবেষণার সহকারী অনিল কাঞ্জিলাল পড়ে শোনাতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। বিশেষ করে নবজাতকের 'কেন' কবিতাটি। কারো মৃত্যু সংবাদ পেলে বিচলিত হয়ে পড়তেন তিনি। হয়তো ভাবতেন নিজের মৃত্যুর কথাও। কখনো কখনো শুনতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি : 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু…'।

অনিল কাঞ্জিলালকে বলতেন : (১) মৃত্যুর পরে কেউ যেন আমার শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বের না করে। (২) শ্রাদ্ধ-বাসরে যেন কীর্তন গান গাওয়া না হয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যেন শোনানো হয় রবীন্দ্রনাথের গান।

হয়তো তাঁর ঘর খুঁজলে এখনো পাওয়া যাবে একটি মূর্তি : 'দি লেডি আই ফল ইন লাভ উইথ।' মূর্তিটি সংগ্রহ করেছিলেন তিনি বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে। কেন করেছিলেন? মূর্তিটির ঠোঁটে ছিল চিরস্থায়ী এক চাপা বিষাদ। হয়তো সেই বিষাদ ছিল তাঁর বড় প্রিয়। প্রিয়ই যদি না হবে, তাকে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে নিয়ে আসবেন কেন কলকাতায়?

তিনি নেই। কিন্তু সেই বিষাদময়ী এখন তাঁর ঘরে অপেক্ষারতা।

—শুভঙ্কর পাঠক

এভাবেই তিনি ফুটে আছেন।

খুউব ভোরে উঠে সূয্যি দেখি। বুক ভরে বাতাস টানি। ভাবতেই পারিনা কোনদিন সূর্য থাকবে না, বাতাস বইবে না।

তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন।

পৃথিবীতে কত ইচ্ছাই তো অপূর্ণ থেকে যায়। সবারই থাকে। ধ্ ধ্ ছেলেবেলায় তিন চাকার সাইকেল এয়ার গান সবুজ কাঁচিচল গুলি, পরবর্তী বয়েসে বাবলি নামের কোন কিশোরী মেয়ের ভালোবাসা—দুঃখ টুঃখ সুখ টুখ হাসি-কান্নার সঙ্গে কত সাধ না মেটাই থেকে গেছে।

সে যুগে জন্মাইনি বলে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাইনি। কাছে যেতে পারিনি। এটা আমার বড় আফশোষ। এখনও যখন গাঢ় বিষণ্ণতায় ডুবে যাই, তখন রবীন্দ্রনাথ এসে আমার হাত ধরেন। দূরে সোনালী রাস্তার দিকে ঋষির মতো লম্বা লম্বা আঙুল দেখিয়ে বলেন—'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু…'।

আমি আশ্বস্থ হই। অভিমান গলে জল হয়ে জমে চোখের কোলে—বরষা নামে। সুনীতিবাবুকেও আমার চোখে দেখা হয়ে ওঠেনি। এটাই আমার বড় আফশোষ। তবে তাঁর বাঁশী শুনেই আমার মন শ্রীরাধিকা। 'আকুল শরীর মম বেআকুল মন বাঁশীর শবদে মোর আউলাইল রন্ধন'।

বাঁশী শুনেছি—অর্থাৎ লেখা পড়েছি। এমন সব লেখা যা বুকের মধ্যে মীড়-মূর্চ্ছনা তুলেছে সেতারের।

প্রবন্ধ বড় জটিল হয়, এরকম ধারণা বোধহয় অনেক মানুষেরই। বেশির ভাগ লোকই বোধহয় প্রবন্ধ দেখলে সযত্নে এড়িয়ে চলেন। সুনীতিকুমারের কিছু প্রবন্ধ পড়ে আমার এসব ব্যাপার—'শক্ত টক্ত' ভাবা ইত্যাদি, কেমন যেন ভুয়ো মনে হয়েছে।

কথায় কথায় কথা বোঝাবার এত সুন্দর ক্ষমতা ক'জনেরই বা ছিলো!

নিজের জীবনে আদর্শে এক মহান মানবিকতাবোধে তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে একথা বারবারই মনে হয়েছে।

কিভাবে কি হয়ে যায়! কি যেন হয়ে যায় হে! কিছুতেই হিসেব মেলে না। ছক বাঁধা কিছু যেন থাকে না পৃথিবীতে। সব উল্টেপাল্টে যায়।

'সুধর্মা' থেকে যে মানুষটি ফুলে ফুলে সেজে বেরুলেন তিনি কোথায় যাবেন? এ যাওয়া কি যাওয়া? জানি না।

সারা জীবন ঋজু তালগাছের মতো মাথা উঁচু করে তিনি সংগ্রাম করেছেন সমস্ত কুসংস্কার অবিচার-এর বিরুদ্ধে। রামায়ণ নিয়ে যে বলিষ্ঠতা তিনি দেখিয়েছেন তা ওই বয়েসে কারুর পক্ষে ভাবা কি সম্ভব? বিশেষ ক'রে এই ভারতভূমিতে! রামকে অবতারত্ব থেকে নামিয়ে আনার সাহস কার ছিলো, ওই ঋষি-আচার্যের ছাড়া?

শুনেছি মূলতঃ প্রাবন্ধিক ভাষাতত্ত্বিক হলেও তিনি ছবি আঁকতেন। আর পড়তেন একদম আধুনিক সাহিত্য। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বইটি তিনি নিজেই খোঁজ করেছিলেন অতীনদার কাছেই। আর আছে নানান গল্প তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে।

থাক সে কূট ক্যাচাল, ধানাই পানাই। ফুলে ফুলে সেজে যে মানুষটি ঈশ্বরের মতো চলে গেলেন তাঁর 'যাওয়া তো নয় যাওয়া'। এ যেন সূর্য হয়ে ফুটে থাকা।

আর আমার অবস্থা তো 'কি গাব আমি কি শুনাব···'গোছের।

কি বা দেবার আছে তাঁকে। এই বাঁজা কলমের কিছু কথা দিয়ে তাঁর গলায় একটা মালা পরাবার চেষ্টা করলুম। কথার মালা।

**কিন্নর রায়**

প্রাচীনকালে ঋষিকবিদের আশীর্ভাষণে ধ্বনিত হয়েছিল, 'জীবেম্ শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্, প্রব্রুয়াম শরদঃ শতম্, শতয়ুসা হবিষা হবিষেম পুর্ণহঃ। অর্থাৎ কোনক্রমে একশো বছর বেঁচে থাকাটাই বড়ো কথা নয়, কর্মবহুল চিন্তানিষ্ঠ কল্যাণপ্রসূ জীবনযাপন করো; শোনো, দেখো, বলো, এগিয়ে চলো—তারপর একদিন শ্লথবৃন্ত সুপক্ক ফলের মতো বিশ্রান্তির মহাসাগরের অতলে তলিয়ে যাও—সম্মুখে শান্তির পারাবার। ঋষি প্রোক্ত এই চেতনায় অবগাহন করেছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক, মানবপ্রেমিক লোককল্যাণকামী আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মহাভারতের মনস্বিনী বিপুলার মন্তব্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি জানিয়েছিলেন, যাঁর মহৎ ও অদ্ভুত চরিত্রের কথা মানুষ চিন্তা করে না, সে শুধু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যিনি বিদ্যার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, মহনায় কর্মের দ্বারা সাধারণকে অতিক্রম করেন তিনিই যথার্থ বরণীয় পুরুষ। বলাবাহুল্য, বিপুলা-কথিত গুণাবলি সুনীতি-কুমারের জীবনে এমনই ভাবে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল, যার নিদর্শন এ-যুগে সত্যিই দুর্লভ।

ভাষাচার্যের নাম সম্পর্কে দু-একটি কথার অবতারণা করা দরকার। বিষ্ণুপুরাণের মতে সুনীতি হচ্ছেন ধ্রুব-জননী ও রাজা উত্তানপাদের অনাদৃতা প্রথমা স্ত্রী। সুনীতিকুমার অর্থাৎ ধ্রুব জীবন-পথ পরিক্রমায় নানা অধ্যায় অতিক্রম করে বিষ্ণুর কাছ থেকে এই আশীর্বাণী পেয়েছিলেন, 'তুমি সকল তারা ও গ্রহগণের উপরে তাদের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকবে। এই স্থানের নাম হবে ধ্রুবলোক।' ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার বহিরাঙ্গিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এ-যুগে নিজেকে উত্থানের সীমান্তশীর্ষে রেখে গেছেন এবং তাঁর নাম ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে 'will be written in letters of light forever.'

আচার্য সুনীতিকুমারের কর্মবহুল জীবনের রূপরেখা অঙ্কনের পূর্বে

আমরা তাঁর মূলতঃ অপরিজ্ঞাত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করব। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দ্বারস্থ হচ্ছি। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে ভারতবর্ষের হিতচিন্তায় তাঁর নিবেদিত প্রাণের অনন্যসুন্দর চিত্র-অঙ্কন প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "ভারতবর্ষের হিতচিন্তায় তাঁহার জীবৎকালের অনেকটা অংশের ব্যয় হইয়াছে। ছোট ছোট কাজেও তাঁহার এই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের কারাবাসকালে স্বপ্রকাশিত ঋগ্বেদ-সংহিতা তাঁহাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া তিনি এই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কাজটা ছোট ; কিন্তু এইরূপ ছোট কাজেই আত্মীয় চেনা যায় ; বিশেষতঃ বন্ধুবর্গের আত্মীয়তার সারতা আপন্নিকষপাষাণেই ধরা পড়ে।" উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশটি থেকে এই সত্যই প্রতীত হয় যে নিছক বড় কাজের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির চরিত্র পরিমাপ করা যায় না ; এই বিষয়ে 'ছোটোর দাবি'র গুরুত্বও সমধিক।

আচার্য সুনীতিকুমার 'ভাষাতাত্ত্বিক' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেখানেই তিনি শেষ হয়ে যান নি। অজস্র তথাকথিত ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর মহত্তর জীবনসাধনার সঙ্গীতটিকে পরিনিনাদিত করেছিলেন। আমরা এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জাতীয় জীবনের কলঙ্ক। মনুষ্যত্বের শুভ্র সমুজ্জ্বল রূপ সেই 'আঁধার রাতে' হয় বিলুপ্ত। ঠিক এমনি একটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ( নোয়াখালি ) এক নির্যাতিতা ও ধর্মান্তরিতা কুমারী মহিলা নারকীয়তা থেকে উদ্ধার লাভের পর কলকাতায় আনীত হলে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই নিগৃহীতার সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্য তার বিবাহে স্বেচ্ছায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের শুষ্ক নীরস জগতে আবদ্ধ না থেকে, O. I. A. ; M. I.

A.-এর তুফান কাটিয়ে আধুনিক যুগের মানবতন্ত্রের উপাসক হয়ে লোককল্যাণের যে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন তার মধ্যে দিয়ে তাঁর সমাজ-সমৃদ্ধতা ও প্রমুক্ত-জীবনাদর্শ প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের মর্মরস আহরণ করে সমাজ-বৎসল সুনীতিকুমার সম্প্রতি বিবাহের পদ্ধতিগত জটিলতার সরলীকরণ করেছিলেন। সময়ের পরিমাপে মাত্র ৪৫ মিনিটেই শাস্ত্রোক্ত-রীতিতে এই 'শুভ-বিবাহ' সমাপ্ত করার পথ দেখিয়েছেন। এই আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতম দুটি ঘটনার সাহায্যে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মহনীয়তা ও উদার মানবতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সত্যসন্ধ সুনীতিকুমার সত্যের সন্ধানে দুর্দমনীয় অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে গেছেন সকল বাধা তুচ্ছ করে। ক্ষুদ্রতার সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে সত্যের মহাসাগরে অবগাহনের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত। যতই তুফান উঠুক, সমালোচনার কালো-মেঘে দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হয়ে যাক সুনীতিকুমার ধ্রুবের মতই ধ্রুব-সন্ধানে নিরত। লোকলজ্জায় চক্ষুলজ্জায় বা 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে তিনি পিছ্-পা হন নি আপন কর্তব্য-কর্ম সমাধা করতে। 'রামায়ণ' সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক মনোভাব যুগ-যুগ লালিত সংস্কারকে আঘাত করেছে। বহু কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে তাঁর উপরে। কিন্তু না—একদিকে সংস্কার অপরদিকে সত্যের সন্ধান ; এর মধ্যে তিনি বেছে নিলেন শেষেরটিকে। আর এখানেই তিনি অনন্য। প্রসঙ্গতঃ তাঁর এই প্রয়াসকে বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ' সম্পাদনের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সেদিনের সেই প্রচেষ্টায় একদল লোক 'গেল গেল' বলে হৈ হৈ করে বিদ্যাসাগরকে যারপরনাই নিন্দা-তীরে বিদ্ধ করেছিলেন। অপ্রাকৃতজনোচিত বহু মন্তব্য সেদিন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বহু বছর পার হয়ে গেছে। আমরা চিন্তাধারায় আধুনিক হয়েছি। ঠিক এমনি সময়ে পরিণত বয়সে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সুনীতিকুমার রামায়ণ নিয়ে

নতুন ধ্যানলোকের সামগ্রী উপহার দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য। ঠিক বিদ্যাসাগরের-ই ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হল এখানে। জানি না, কেন। তবে এটুকু জানি—শাস্ত্র যেমন সেদিন সকলে পড়ে নি, বিদ্যাসাগরকে অনেক হা-হুতাশ করতে হয়েছে তার জন্যে; ঠিক তেমনি রামায়ণও এযুগে যথা-অর্থে পড়েছে ক'জন তাঁর জন্যে আক্ষেপ করতে হয়েছে সুনীতিবাবুকে। আমাদের বেদনা আরও বেশী এই কারণে যে, সুনীতিবাবু তাঁর কাজ পরিসমাপ্ত করে যেতে পারলেন না।

সুনীতিবাবু Purist. সোজা কথায় তিনি out and out a Purist. এই Purist হওয়ার ফলে শব্দ ও ভাষাবিজ্ঞানের বিশুদ্ধির দিকে তাঁর সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই Purist ছিলেন বলে তাঁর ভাষা তত সুন্দর নয়। কারণ Purist-এর ভাষায় তথাকথিত লাবণ্য, মাধুর্য আসে না। তাঁকে অনেক মেপে চলতে হয়, ভেবে বলতে হয়; তিনি চলতে গিয়ে নেচে উঠতে পারেন না, বলতে গিয়ে গেয়ে উঠতে পারেন না। শব্দের accuracy-র দিকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। এ-বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

সুনীতিকুমার পরিহাস-রসিক ছিলেন। হাসতে জানতেন, হাসাতে জানতেন, কিন্তু ভাঁড়ামি ছিল না। একটি ছেলে বাড়ীতে গিয়ে আলাপ-আলোচনার সময় উচ্চারণের গোলমাল করলে হাসতে হাসতে বললেন, শ্যামবাজারের শশীবাবু······।

সুনীতিবাবু ভোজন-রসিক ছিলেন। খুব খেতে পারতেন। মুরগী প্রসঙ্গে তাঁর সেই প্রবাদপ্রতিম কথা,—'It is very ugly when on legs, but very palatable when on table.'

ইংরেজীতে Scrutineer ও Scrutiniser এই দুটি শব্দ মূলতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুনীতিবাবু Scrutiniser-এর পরিবর্তে Scrutineer শব্দটির প্রচলন ঘটান। (শব্দটির উদ্ভাবক তিনি নন।) শব্দটি আজ বহুল প্রচলিত।

সুনীতিবাবু Head examiner হবার পর (1936 সাল)

Scrutineer-দের খাওয়াতে আরম্ভ করলেন। স্মরণ রাখা দরকার এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর পূর্বে এর রেওয়াজ ছিল না। সুনীতিবাবু-ই এর পথপ্রদর্শক। অবশ্য পরবর্তীকালে এই খাওয়ানোর ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বই পেয়েছে।

সুনীতিকুমারের পরলোকগমনে একটি বৈঠকী যুগের অবসান হয়ে গেল। বৈঠকী আলাপে তিনি যেন সনাতনী ঐতিহ্যের শেষ উত্তরসূরী। এরকম বৈঠকী আলাপ জমাতে তাঁর মত মুন্সীয়ানা খুব কম জনের মধ্যেই দেখা যাবে। এক ঘণ্টার আলাপেই তিনি একমাসের খোরাক দিয়ে দিতে পারতেন। এই নির্মল শুভ্র আলাপন বিশেষ কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠত না। যে-কোন বিষয়েই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দবিহার। ভাষাতত্ত্বের কঠিন প্রস্তর ভেদ করে আলাপী মানুষটির তাজা প্রাণের সহাস্য প্রাণোচ্ছল প্রবাহ ঝরনার মত বেরিয়ে আসত—আর সেই প্রাণময়তার গঙ্গা-যমুনায় যারা ডুব দিয়ে গাগরী ভরে নিয়েছেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান্।

তাঁর versatility-কে নমস্কার করতেই হয়। এমন কোন বিষয় ছিল না যেখানে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। জ্ঞানের প্রসারতায় তিনি সত্যিই একটি কিংবদন্তী।

বাংলা ব্যাকরণের বর্তমান যে-রূপ, তার কায়া-গঠন ও সৌধনির্মাণ সুনীতিবাবুকেই করতে হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার অমর হয়ে থাকবেন তাঁর O. D. B. L-র জন্য। 'শেষের কবিতা'-য় তাঁর প্রসঙ্গ তাঁকে দুর্লভ খ্যাতির সম্মানে প্রতিনন্দিত করেছে। ১৯২৬-এ প্রকাশিত গ্রন্থটির ৫০ বৎসর পূর্তি এই সেদিনে উদ্‌যাপিত হলো; আর তার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা হারালাম তাঁকে। এ ঠিক বসু-আইনস্টাইন থিয়োরীর ৫০ বছর পূর্তির পরেই জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বহুজনের মধ্যে এই খেদোক্তি শুনেছি যে, সুনীতিবাবু ১৯২৬-এই শেষ হয়ে গেছেন। তারপর আর নতুন কিছু করেন নি, নতুন কিছু

দেন নি। কিন্তু যাঁরা সুনীতিবাবুকে জানতেন তাঁরা জানেন তিনি কখনো থেমে থাকেন নি, নিশ্চল-নিশ্চুপ হয়ে যান নি। তিনি প্রাচীন ঋষির চলার বাণী 'চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত। তাই নিত্য-নূতন কর্মযজ্ঞে, গবেষণা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন তিনি। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সেই প্রযত্ন অক্ষুণ্ণ ছিল। এই অনন্য-পুরুষের উদারচরিত্রকে, প্রশস্ত হৃদয়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রবন্ধের ছেদ টানছি।

—সমীরকুমার বসু

আমার মত একজন অর্ধশিক্ষিত কলমনবিশের পক্ষে আচার্য সুনীতিকুমার প্রসঙ্গে বাক্য-বিন্যাস করাটাই সম্ভবত চূড়ান্ত ধৃষ্টতা, যেমন ধৃষ্টতা সমুদ্রকে পরিমাপ করা। আমরা ভাগ্যবান এবং কৃতজ্ঞ এই কথা ভেবে যে, আমাদের জীবনে আমরা এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যিনি আগামী ভবিষ্যতে হবেন কিংবদন্তীর নায়ক। জ্ঞান যখন ক্রমশই সঙ্কুচিত, আমাদের সাধ্য যখন ক্রমশই সীমায়িত এবং আমাদের সাধনা একান্তই সীমিত, তখন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক কালজয়ী প্রতিভা আর কি দেখতে পাব? আরেকজন রবীন্দ্রনাথ, কিংবা বিবেকানন্দ অথবা বিদ্যাসাগরকে কি আমরা দেখার আশা করি? ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে আরেকজন সুনীতিকুমারকে দেখব—তেমন প্রত্যাশা কি মূঢ়তা নয়? পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েই আমরা যখন বার্ধক্যের হাতছানিকে বরণ করে নিতে বাধ্য হই, ষাট বছরে যখন প্রমাণিত হই নির্বাসিত জীবনের উত্তরাধিকারী, তখন সাতাশি বছরেও একজন মানুষ যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দাম এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পুরোপুরি কর্মময় জীবনের অধিকার ভোগ করছেন—এমন বিরল দৃশ্য সহজে কি দেখা যাবে? যেমন মহাকাব্যের

যুগ শেষ হয়ে গেছে, তেমনি বিরাট প্রতিভার যুগও বোধহয় শেষ হতে চলেছে। অর্থাৎ, আত্মকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন আমরা ক্রমশই আত্মসঙ্কোচনের পথে এগিয়ে চলেছি। তাই কেউই আর সম্পূর্ণ মানুষ নই। যেমন আর কোন চিকিৎসকই সম্পূর্ণ চিকিৎসক নন—সকলেই বিশেষজ্ঞ। ফলে আমরা অনেক হার্ট স্পেশালিষ্ট পেয়েছি, পেয়েছি আরও অনেক স্পেশালিষ্ট, কিন্তু একজন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত সম্পূর্ণ চিকিৎসক পেলাম না।

সুনীতিকুমারকে প্রণাম জানাতে পারি, কিন্তু তাঁর বিরাট অস্তিত্বের পরিমাপ করি, কিংবা পর্যালোচনা করি—এমন ক্ষমতা কোথায়? এমন ভদ্রজন যেমন এ যুগে দুর্লভ, তেমনি দুর্লভ এমন কর্মযোগী। জীবনকে তিনি ব্যাপ্ত করেছিলেন, পরিব্যাপ্ত করেছিলেন গভীর থেকে গভীরে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আমরা শুধু অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি।

মানুষের গড়পড়তা আয়ুর ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের প্রয়াণকে অকাল প্রয়াণ বলা চলে না, কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনের কীর্তি ও সাধনাকে গড়পড়তার মাপকাঠিতে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতার নামান্তর। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের জাতীয়-জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো সে শূন্যতা কোনদিন পূরণ হবার নয়। এ কারণেই দেশ আজ শোকগ্রস্ত। শোক এই কারণে যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের আরও একটি দীর্ঘ সেতু চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে গেলো। সুনীতিকুমার তো শুধুই একজন ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা পণ্ডিত ছিলেন না—ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। তাঁর মৃত্যুতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদৃঢ় সোপানগুলি ভেঙে পড়লো। দেশ আজ নিঃসন্দেহে নিঃস্ব, রিক্ত। বিদ্যাসাগরের পর এতবড় প্রাজ্ঞ আমাদের মধ্যে আর কেউ আসেন নি। ভাষাতাত্ত্বিক তো কতই আছেন। দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ভাষা সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলেই অমোঘভাবে সুনীতিকুমারের শরণাপন্ন

হতে হয়—হতে হবে চিরকাল। বিদ্যাসাগর যেমন একজন, শতেক ভাষাতাত্ত্বিকের গণ্ডী পার হয়ে সুনীতিকুমারও এক এবং অনন্য। জাতির স্বীকৃতির রত্নহার অনেকেই পেয়েছেন এবং পেয়ে থাকবেন। কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে কিংবদন্তীর নায়ক হতে পারে ক'জন? এই দুর্লভ সম্মানের কাছে জাতীয় অধ্যাপকের আসন, পদ্মবিভূষণ, সাহিত্য আকাদেমীর মধ্যমণি সব কিছু যেন নেহাতই তুচ্ছ বলে মনে হয়। সুনীতিকুমারকে একমাত্র সুনীতিকুমার উপাধিতেই বিভূষিত করা চলে।

সুনীতিকুমার যে কতবড় মুক্ত মনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ভাষা কমিশনের প্রধান হিসাবে তাঁর কার্যাবলি থেকে। যখন কংগ্রেস সরকার সারা ভারতে জোর-জবরদস্তি করে হিন্দি চালানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেপড়ে লেগেছিলো—সুনীতি-কুমারই এই অন্যায় অযৌক্তিক নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এতে তিনি প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয়েও নতি স্বীকার করেন নি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রোমক লিপির সপক্ষে তাঁর সারগর্ভ রচনাগুলি। এই সব অমূল্য রচনার মধ্যে তিনি যে বক্তব্য ও নির্দেশ রেখে গেছেন তার যদি খণ্ডাংশও কেউ অনুসরণ করে, তবে তিনি যথার্থই ভাগ্যবান বলে নিজেকে মনে করতে পারবেন। 'অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' সুনীতিকুমারের এক বিশ্রুত কীর্তি। তথাপি এই অমূল্য গ্রন্থটিও তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের সামান্য অংশ মাত্র। তথাপি যেন কোন ব্যক্তি বা রচয়িতার পক্ষে এই একটি মাত্র গ্রন্থই জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকতে পারে।

সুনীতিকুমারের শতধা সাধনার মধ্যে যে সাধনাকে তিনি জীবন-বেদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, তা বোধহয় দূরকে নিকট করা আর পরকে ভাই বলে গ্রহণ করার সাধনা। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন কবিগুরুর একান্ত সহযাত্রী ও ধারাবাহী। কবি যে তাঁকে

কত স্নেহ করতেন, তাঁর প্রাজ্ঞতা ও মণীষাকে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শেষের কবিতা'র নায়ক অমিত রায়কে দেখা যায় সুনীতি চাটুজ্যের শব্দতত্ত্বের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। শিলং পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েও তিনি এই বইটি সঙ্গে নিতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সুনীতিকুমারের কীর্তিকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গেছেন। এই ঘটনার মধ্যেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ কতদূর ছিলো। কবির সঙ্গে তিনি বহুবার বিদেশ পরিভ্রমণে গেছেন। ১৯২৭ সালে তিনি কবির সঙ্গে মালয়, কম্বোডিয়া, জাভা, সুমাত্রা, বালিদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে গিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক পরিক্রমার কথা তিনি 'দ্বীপময় ভারত' নামের গ্রন্থটিতে অত্যন্ত নিপুণ কলমে চিত্রিত করে গেছেন। এই গ্রন্থটির মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সুনীতিকুমারের গভীর জ্ঞানের স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিল্পকলার সঙ্গে সমাজ ও কালের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা। ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির যে কোন শাখাতেই তিনি অনায়াস ভাবে বিচরণ করে গেছেন। এর মধ্যে যে কোন একটি বিষয়কে আলাদাভাবে বেছে নিলেই সুনীতিকুমারের একটি স্বকীয় রূপ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না।

সুনীতিকুমার ভারতের ভাষা সমন্বয় ও সংহতির পথ রচনা করে গেছেন। সেই স্বরচিত পথ ধরে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন বহুদূর পর্যন্ত। এখন পথের যে অংশটুকু বাকী সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার ভার ও দায়িত্ব তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন। এই পথের শেষ প্রান্তে যেদিন আমরা পৌছোতে পারবো সেদিনই তাঁকে জানানো হবে প্রকৃত প্রণতি।

—**প্রণবেশ চক্রবর্ত্তী**

"জীবন-দর্শন!" কত মধুর, অথচ কত নিগূঢ় কথা এটা! কিন্তু যদি আমরা কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে অল্প মাত্র হলেও কিছু জানতে চাই, তা'হলে আমাদের 'যেন তেন প্রকারেণ' জানতেই হবে তাঁর অন্তর্নিহিত জীবন দর্শন সম্বন্ধে—কারণ মানুষের আছে বহু দিক, বহু স্তর, বহু রূপ—তা'হলেও মানুষটি ত সেই একই, যেহেতু তাঁর অসংখ্য চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি-ভাব, আকুতি-প্রবৃত্তি একটি কেন্দ্রীভূত আদর্শ বা লক্ষ্য থেকেই উদ্ভূত হয়। যেমন, সহস্ররশ্মি সূর্যের সহস্র কিরণ একটা কেন্দ্রীভূত আলোক-গোলক থেকেই নিঃসৃত হয়ে দিগ্-বিদিক্ আলোকিত করে; যেমন সহস্রদল পদ্মের সহস্রদল একটি কেন্দ্রীভূত বীজকোষ থেকেই বিকশিত হয়ে দিগ্‌বিদিক্ আমোদিত করে; যেমন 'সহস্রধারা নদীর সহস্রধারা একটি কেন্দ্রীভূত উৎস থেকেই প্রবাহিত হয়ে দিগ্‌বিদিক্ শীতল করে, ঠিক তেমনি মানুষের জ্ঞানের আলোক, ভক্তির সৌরভ, কর্মের ধারা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের একটা মূল তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট হয়ে', তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করে সগৌরবে।

বিশেষ করে, যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁদের মহাজীবন শতদিকে বিস্তৃত, শতদিকে লীলায়িত, শতদিকে সার্থকীভূত—তাঁদের প্রাণের সেই শাশ্বত সত্যকেই, সেই একক সত্যকেই, সেই অনুপম সত্যকেই ত তাঁরা নিরন্তর প্রকাশিত করেন তাঁদের সুধন্য দেবাশীর্বাদপূত জীবন-যজ্ঞের প্রত্যেক মন্ত্রে, প্রত্যেক বন্দনায়, প্রত্যেক আহুতিতে সানন্দে। এরূপে, তাঁরা নিজেদের কোনক্রমেই 'লুক্কায়িত না রেখে', জগৎ সমক্ষে সাগ্রহে সাদরে বিস্তৃত করে দেন বিনা দ্বিধায়—কি পরম সৌভাগ্য আমাদের!

আচার্য সুনীতিকুমারও এই একই ভাবে ছিলেন মহাজীবনের অধিকারী। সত্যই কি বিরাট-বিশাল, ভূমা-মহান্, গভীর সুধীর-ছিল তাঁর সমগ্র সুধন্য জীবন--বহুমুখী প্রতিভাবিশিষ্ট, সর্বগুণশক্তি বিমণ্ডিত সার্বজনীন ভাবান্বিত। কি অপূর্ব ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য,

কি অভিনব বিচার-বুদ্ধি, কি অনুপম বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, কি অতুলনীয় উপলব্ধি-মহিমা। বস্তুতঃ একাধারে এরূপ অসংখ্য কৃতিত্বের অধিকারী জন অতি অল্পই আছে। কিন্তু, সব কিছুর মধ্যে তাঁর প্রশান্ত-প্রসন্ন-প্রবুদ্ধ আত্মার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারতাম, পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম তাঁর অত্যাশ্চর্য জীবনদর্শনের মূল সত্যটিকে। একটি সুন্দর উপমার কথা মনে পড়ছে—একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে যদি একটি কাষ্ঠ-পেটিকায় রাখা হয়, তা'হলে তার সুবর্ণ-প্রভা আর দেখতে পাবে কে? কিন্তু যদি সেই একই প্রদীপটিকে একটি কাঁচের ঘটের মধ্যে রাখা হয়, তা'হলে তার সেই সুবর্ণ-প্রভাই উজ্জ্বলতর হয়ে, সুন্দরতর হয়ে, 'মধুরতর হয়ে' শতজনকে তৃপ্ত করে। একই ভাবে, আচার্যদেবের জীবনও ছিল আদ্যোপান্ত স্বচ্ছ, সরল, উদার-মুক্ত, যার অনির্বাণ জ্যোতি, বিকশিত সুষমা, প্রসারিত মহিমা সকলেই মুগ্ধ, তৃপ্ত ও চমৎকৃত না করে পারত না।

আমরাও সমভাবে পরমশ্রদ্ধেয় আচার্যদেবের জীবনের মহাসত্যকে আজীবন দর্শন করে' ধন্যাতিধন্য বোধ করেছি। কি সেই মহাসত্য, কি সেই মূলীভূত তত্ত্ব, কি সেই পরম আদর্শ? তা ব্যক্ত করা যায় একটি ক্ষুদ্র মধুর, সরল কথায়—"প্রীতি"—তিনি জীবনকে ভাল বাসতেন, জীবকে ভাল বাসতেন, জগৎকে ভাল বাসতেন।

প্রায় দেখা যায় যে, যাঁরা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁরা স্বভাবে রুক্ষ, শুষ্ক, তিক্ত হয়ে পড়েন। কেবল অতি কঠিন গ্রন্থসমূহ পাঠ করে' করে', কেবল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি বিচারে কালাতিপাত করে' করে' কেবল অপরকে বিদ্যা-বুদ্ধিতে পরাজিত করতে প্রচেষ্টা করে' করে' স্বভাবতঃই তাঁরা অচিরেই হয়ে পড়েন "শুষ্ক কাষ্ঠবৎ" নীরস, নির্জীব, নিরুৎসাহ; এমন কি, সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপরও কেবল নিজের পাণ্ডিত্যের, জয়ের প্রগতির কথা ভেবে ভেবে—তাঁদের ক্ষুদ্র পাঠ-কক্ষের বাইরে যে রয়েছে বৃহৎ মানব সমাজ, বৃহত্তর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাদের প্রতি তাঁদের

থাকেনা কোনো আকর্ষণ বা প্রেম ; তাঁরা কেবল নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা মেটাতেই উদ্‌গ্রীব ; নিজেদের বিজয় লাভেই সন্তুষ্ট।

কিন্তু আচার্যদেব ছিলেন ঠিক এর বিপরীত—তিনি যেমন ভালবাসতেন নিজেকে, তার চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসতেন অপরকে—সকল মানবকে, সমগ্র জগৎকে। প্রথমতঃ নিজেকে ভালবাসতেন কি করে? স্বার্থপরের মত কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ধন-জন-মান, উচ্চপদ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পার্থিব বস্তু নিয়ে নয়—নিজেকে জ্ঞানে কর্মে-সেবায়-সাধনায় ত্যাগে-তপস্যায় বিকশিত করে অহরহ পরম প্রীতি ভরে। বস্তুতঃ নিজেদের প্রতিও ত আমাদের কর্তব্য আছে, নিজেদের ত ঘৃণা ভরে অবহেলা করা চলবে না, কারণ নিজেরা পূর্বে প্রস্তুত না হলে', অপরকে পরে সাহায্য করা যাবে কিরূপে? সেজন্যই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের একটি অতি সুন্দর মন্ত্র দিয়েছিলেন—

"Be and Make"!

"হও এবং কর"।

প্রথমে নিজে পূর্ণ হও, পরে অপরকে পূর্ণ কর ; নিজে মহৎ হও, অপরকেও মহৎ কর ; নিজে সুখী হও, অপরকেও সুখী কর।

আচার্যদেব এই মহামন্ত্রেরই ছিলেন মূর্ত প্রতীক, সার্থক রূপায়ণ, পুণ্য প্রকাশ, ধন্য প্রমাণ। সেজন্য তিনি নিজের প্রচেষ্টায় নিজেকে যে ভাবে সর্বগুণশক্তিসমন্বিত করে তুলেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই অপরকেও যথাসাধ্য ঠিক তাই করে' তুলতেও তাঁর প্রচেষ্টার অবধি ছিল না ; এবং তিনি তা' করতেন কেবল শুষ্ক কঠোর কর্তব্য বোধ থেকে নয়, প্রাণের প্রীতির অফুরন্ত নির্ঝর থেকে। এক্ষেত্রে, প্রথমতঃ আদর্শ গুরুরূপে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি স্নেহ-প্রীতির সীমা-পরিসীমা ছিল না। অসংখ্য ছিল তাঁর ছাত্রছাত্রী—কিন্তু কি আশ্চর্য ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি—মনে রাখতেন সবাইকে, এবং আজীবন তাঁদের কল্যাণ করে' যেতেন সমানে অহরহ। তাঁর কাছে সার্টিফিকেট

চেয়ে কেহ দেখেছেন কি? দেখেননি কি তিনি কত সাগ্রহে, সাদরে, সানন্দে তৎক্ষণাৎ তা' লিখে দিতেন প্রকাণ্ড ২।৩ পাতা ভরে উচ্চতম প্রশংসাবাণীসহ। আমার সেই মধুময় অভিজ্ঞতা হয়েছে কয়েকবার —বিদেশে গবেষণার জন্যই হোক, অথবা স্বদেশে চাকুরী লাভের জন্যই হোক—তাঁর অজস্র গুণবর্ণনা এবং শুভেচ্ছা-আশীর্বাদের স্রোতে পড়ে', 'হাবুডুবু' খেয়ে সবিস্ময়ে ভেবেছি—এ' কি অপূর্ব স্নেহ!

একই ভাবে, ছাত্র-জগতের বাইরে যে সুবিশাল মানবজগৎ পড়ে আছে—সেখানেও তাঁর প্রীতির নির্ঝর সমান বেগে উৎসারিত হয়েছে। তাঁর বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা ছিল প্রায় অসীম এবং সকলকেই তিনি অতি আপন জন, অতি নিকট জন, অতি প্রিয়জন রূপে সানন্দে সাদরে সাগ্রহে বক্ষে স্থান দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে আমাদের ঋষিদের সেই পরমা বাণী—

"অয়ং নিজো পরো বেতি
গণনা লঘুচেতসাম্॥
উদার চরিতানাঞ্চ
বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"
"এইটি আপন ঐটি পর
এরূপ বলেন ক্ষুদ্রগণ॥
উদার হৃদয় যাঁরা তাদের
বিশ্বভুবন আপনজন॥"

এই মহাবাণীর কি সার্থক রূপায়ণ আমাদের আচার্যদেব স্বয়ং— "বসুধৈব কুটুম্বকম্," —"বিশ্বভুবন আপনজন"—আচার্যদেবের সত্যই মানুষ সৃষ্টি করবার, পালন করবার, জয় করবার কি অনন্ত অসীম ক্ষমতা ছিল—যা অন্যদেরও আরো অধিক থাকলে নিশ্চয়ই মর্ত্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হত স্বর্গরাজ্য সগৌরবে!

ডঃ রমা চৌধুরী

তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে এবং ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ-এর অবসর গ্রহণের পর তিনিই হবেন রাষ্ট্রপতি এমন একটা কথাও নাকি খুবই চালু দিল্লীতে—দূর বিদেশে এ খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। একজন বাঙালির পক্ষে হঠাৎ এরূপ সংবাদে খুশিতে উচ্ছল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আর খবরটা এমন লোকের কাছ থেকে পেয়েছিলাম. যার কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এবং সে সময়ে তেমনি একটা পরিবেশও দেশে সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক বছর উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন থেকে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ স্বভাবতঃই আশা করে'ছলেন ১৯৫৭ সালে তিনিই হবেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্থলাভিষিক্ত। ভারতরাষ্ট্র সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষিত হলে ১৯৫০ সালে ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫২ সালে পাঁচ বছরের জন্যে ঐ পদে তাঁকে পুনরায় অভিষিক্ত করা হয় আর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। সাত বছর রাষ্ট্রপতি থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবসর গ্রহণ করলে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সে পদে উন্নীত হবেন এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন আর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারত-মনীষী ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—এ সম্ভাবনা মোটেই অযৌক্তিক ছিল না। সেই সম্ভাবিত সংবাদই জানতে পেরেছিলেম ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের একমাত্র পুত্র সে সময়ে আমেরিকায় কর্মরত শ্রীমান সুমন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখ থেকে।

সেটা ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কথা। আমি তখন উত্তর আমেরিকার দাক্ষিণী শহর নিউ অর্লিন্সে। স্থানীয় সংবাদপত্রে আমার এক সচিত্র সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়েই সকাল বেলা শ্রীমান সুমন তাঁর এক বাঙালী বন্ধুকে নিয়ে আমার হোটেলে এসে

উপস্থিত। এসেই ওরা ওদের আস্তানায় ধরে নিয়ে গেলেন অনেক কথা জানাবেন ও শোনাবেন বলে। মধ্যাহ্ন ভোজ ওখানেই, হোটেলে নয়। একেবারে খাঁটি কলকাতার খানা।

ঐ খাবার টেবিলেই সম্ভাবিত আনন্দ-সংবাদটি পরিবেষণ করেছিলেন শ্রীমান সুমন এবং সে সম্পর্কে আমার কিছু জানা আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। আমি কিন্তু সেবার বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে শুনে গিয়েছিলাম, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আরেকটা টার্ম রাষ্ট্রপতি পদে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর জন্যে একটা চাপ সৃষ্টিও করেছেন। ব্যাপারটা জানাজানি হলে রাধাকৃষ্ণণ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন, ১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি আর দিল্লীতেই থাকবেন না।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর অনুরোধে অবশ্য ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে আরেকবারও উপরাষ্ট্রপতি পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ১৯৫৭ সালে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা হলে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তখন শান্তি অক্ষুন্ন রাখা একান্তই প্রয়োজন ছিল। তা না হলে কে অস্বীকার করবে যে সেবারের রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতি পদে ভারতের দুই সেরা মনীষী সর্বপল্লী ও সুনীতিকুমার নির্বাচিত হলে বিশ্বের দরবারে এদেশের সুনাম ও সম্মান অনেক বেশী বেড়ে যেতো ?

দর্শনাচার্য ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ১৯৬২ সালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অবসর গ্রহণের পরে রাষ্ট্রপতি পদে বৃত হয়েছিলেন বটে কিন্তু সে সময়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে উপরাষ্ট্রপতি পদাভিষিক্ত করার মানসিকতাই ছিল না সংখ্যাগুরু হিন্দীভাষী সংসদ সদস্যদের এবং হিন্দীভাষী ও হিন্দীসমর্থক রাজ্যের বিধান-সভাসমূহের। গোড়ায় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ব্যাপারে হিন্দীর পক্ষে প্রচুর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করলেও হিন্দী ভাষীদের উগ্রতায় সুনীতিকুমার অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মতেরও অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছিল

হিন্দীভাষার দাবী সম্পর্কে। এ অবস্থায় ১৯৬২ সালে আচার্য সুনীতিকুমারের নাম উপরাষ্ট্রপতিপদে প্রস্তাবিত হবে, কী করেই বা তা আশা করা যাবে? এমন অসামান্য প্রতিভাধরকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করতে না পারা স্বাধীন ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই লজ্জার কারণ। তবু ভালো, ভারত সরকার তাঁকে সাহিত্য একাদেমীর সভাপতি ও অন্যতম জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন।

সমসাময়িক দুই বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় জ্ঞান তাপস ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। একজন দক্ষিণের ও অপর জন উত্তরের। দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্তের দুই মহীরুহ। শাশ্বত ভারতের দুই যোগ্য প্রতিনিধি। দার্শনিক বলে রাধাকৃষ্ণণ যেমন শুধু মাত্র দর্শন শাস্ত্রেই মহাপণ্ডিত ছিলেন না, ঠিক তেমনি বহুভাষাবিদ বলে সুনীতিকুমারও কেবল মাত্র ভাষাচর্চায়ই তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন নি—এই দুই মহান শিক্ষাব্রতীই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে ও বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে ছিলেন অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই রাধাকৃষ্ণণের পর সুনীতিকুমারকে যদি রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করে নেওয়া হতো তা হলে শুধু রাষ্ট্রপতি পদেরই নয়, ভারত রাষ্ট্রেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু তাতো হবার নয়—তিনি যে ছিলেন বাঙালী এবং স্বাধীন মতবাদে বিশ্বাসী।

সারাবিশ্বে কী অতুলনীয় জনপ্রিয়তারই না অধিকারী ছিলেন সুনীতিকুমার! প্রাচ্যখণ্ডে ও ইয়োরোপের সমস্ত দেশের বিদ্বজ্জন মহলেই সুনীতিকুমার প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলে লক্ষ্য করা যায় তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলেই কতখানি বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা পোষণ করেন। আমি এখানে শুধু একটি মাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করবো যা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে সোভিয়েত রাশিয়ায় কী অপরিসীম জনপ্রিয়তা সুনীতিকুমারের।

সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে আমরা ছয়জন ভারতীয় কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ১৯৬৭ সালের মে মাসে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলাম পুরস্কার দাতাদের আমন্ত্রণে। সোভিয়েত দেশের যেখানেই গিয়েছি তার প্রায় সব জায়গাতেই ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের কথা উঠেছে। নিজের পাণ্ডিত্যের পটভূমিকা তো আছেই, তা ছাড়া তাঁকে বার বার সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে যোগদানের জন্যে। এ কারণে সুনীতিকুমার রাশিয়ার মানুষের কাছে একটি অতি পরিচিত নাম। তবে সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগায় উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় পেয়েছিলাম, সত্যি তার তুলনা হয় না এবং তা ভোলবার নয়।

আমরা ষোলই মে তারিখে রিগায় গিয়ে পৌঁছুলাম। স্থানীয় রাইটার্স ইউনিয়নের সম্বর্ধনায় পারস্পরিক পরিচয়ে ল্যাটভিয়ান লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় মহিলা-কবি শ্রীমতী মীর্জা কেম্পে। আমি বাংলা ভাষার কবি ও কলকাতার লোক শুনেই তিনি তাঁর 'দাদা'র খবর জানতে চাইলেন। আমায় অপ্রস্তুত দেখে নিজেই তিনি এগিয়ে এলেন আমার সাহায্যে। জিজ্ঞেস করলেন, দাদা সুনীতিকুমার ভালো আছেন তো? আমার কাছ থেকে তাঁর কুশল সংবাদ পেয়েই তিনি বললেন, দু'দিন আগেই তিনি 'দাদা'র চিঠি পেয়েছেন এবং সে চিঠির উত্তরও দেওয়া হয়ে গেছে। সুনীতিকুমারের সঙ্গে যে তাঁর নিয়মিত পত্র-বিনিময় চলে, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রায়ই পত্রালাপ হয়, নয় খণ্ড কাব্য সংকলনের প্রথিতযশা কবি ভারত-প্রেমী শ্রীমতী মীর্জা কেম্পে তাও আমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গভীর ভারত-প্রেম সেদিন তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তিনি যখন স্বরচিত দীর্ঘ কবিতা 'নেহেরুর চিতাভস্ম' (Ashes of Nehru) আমাদের পড়ে

শোনাচ্ছিলেন। তাঁর গলায় ঝোলানো স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র-খচিত লকেটটিও তাঁর আন্তরিক ভারত-প্রীতির পরিচায়ক। যে দু'দিন আমরা রিগায় ছিলাম প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমরা এই বয়স্কা মহিলা কবির সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাঁর ভারত পর্যটনের গল্প শুনেছি তাঁর নিজের মুখে। শেষবার তিনি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন নেহেরু বিয়োগের পর। 'নেহেরুর চিতাভস্ম' কাবতাটি সেই সময়ের লেখা। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভারতের মানুষ ও প্রকৃতি আমায় মুগ্ধ করেছে এবং সে দেশের দুই মহান নায়কের ছবি আমার চিত্তে চিরকাল অঙ্কিত থাকবে—একজন ভারত রাষ্ট্রের স্বর্গত কর্ণধার জওহরলাল নেহেরু এবং অপরজন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও যিনি কলা ও বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধানে সদা-তৎপর সেই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভারত তত্ত্ববিদ্‌দের মস্ত সহায় ছিলেন সুনীতিকুমার। সমস্ত ভারতবিদ্যাবিশারদরা তো বটেই, বহু ভাষাভাষী ও বহুজাতি অধ্যুষিত বিরাট দেশ ভারত সম্পর্কে যারাই গবেষণায় উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের প্রায় সকলেই সুনীতিকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যগ্র হয়ে উঠতেন, তা' না হলে যে নিজেদের কাছেই তাঁদের গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ বলে মনে হতো না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসন অলঙ্কৃত করার পক্ষে যোগ্যতায় সুনীতিকুমারের সমকক্ষ আর কেইবা ছিলেন রাধাকৃষ্ণণের পর? কিন্তু তা'হলে কি হবে, যে অপরিচ্ছন্ন রাজনীতি প্রশ্রয় পেয়ে এসেছিল স্বাধীন ভারতে তাতে যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠিই যে অন্যকিছু! তাই মনে হয়, আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তাঁকে যে উপরাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করতে হয়নি, তাতে সুনীতিকুমারের গৌরব বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে।

সুনীতিকুমার যথার্থই ছিলেন স্নেহপ্রবণ মানুষ। সময় সময়

বাইরে রুক্ষতা প্রকাশ পেলেও এবং তার ফলে তাকে ভুল বুঝবার যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও তিনি নিজে কিন্তু কারো প্রতি রাগ বা বিরক্তি বেশিক্ষণ মনে রাখতেন না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, তিনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা মোটেই পছন্দ করতেন না। কেউ জোর করে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে তিনি অত্যন্ত রেগে যেতেন এবং কখনো কখনো গালমন্দও করতেন। কিন্তু সে সব একান্তই সাময়িক ব্যাপার। বহু আলোচিত এমনি সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা এখানে অবান্তর।

অনেকের মতো আমিও আচার্য সুনীতিকুমারের স্নেহসান্নিধ্য বহু বছর ধরে লাভ করেছি এবং তাঁর স্নেহের জোরেই তাঁকে দিয়ে আমার দু'একটি অনুরোধও রক্ষা করিয়ে নিতে পেরেছি। না, আমার কোনো স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার নয়, তেমন অনুরোধ কখনো আমি করিনি। তবে এমনও হয়েছে, বার বার অনুরোধেও তাঁকে আমি কোনো কোনো বিষয়ে রাজী করাতে পারিনি। এসবের নিদর্শন উল্লেখের আগে কোন্ কোন্ বিষয়ে কখন কি ভাবে ভাষাচার্যের স্নেহের উত্তাপ আমি অনুভব করেছি তারই কিছু কথা এখানে বলে নেয়া যাক। ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার কমিটি সাংবাদিকতায় আমাকে প্রথম পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আচার্য সুনীতিকুমার আমায় বলেছিলেন, কমিটির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সভাপতি হিসাবে তিনি খুবই আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেছিলেন। সকল সদস্যের মুখে আমার 'আত্মচরিতে সমাজচিত্র' বিষয়ক রচনা বলীর প্রশংসা শুনে, তবে রাশিয়ার মহান লেখকদের আত্মজীবনী বিশ্লেষণ করে যে ভাষায় ঐ রচনাবলী লেখা হয়েছে তা সাহিত্যেরই ভাষা, সাংবাদিকতার ভাষা নয়—কাজেই এ পুরস্কার সাংবাদিকতার না হয়ে সাহিত্যের পুরস্কার বলে ঘোষিত হলেই তিনি বেশি খুশি হতেন এবং তা শোভনও হতো।

আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ পরবশ না হলে তিনি কখনোই এরকম

কথা বলতেন না। এ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পরের বছরের আরেকটি ঘটনায় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহস্পর্শ আমি অনুভব করেছিলাম। ১৯৬৭ সালের শেষদিকে হঠাৎ একদিন একটি ফোন কল এলো ভাষাচার্যের কাছ থেকে। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানালেন, রিগা থেকে মীর্জা কেম্পের একখানা চিঠি এসেছে ক'দিন আগে। তিনি তাঁদের রাইটার্স ইউনিয়নের মুখপত্রের সাম্প্রতিক সংখ্যার একখানি কপিও পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার একটি কবিতার অনুবাদ আমার ফটোচিত্রসহ প্রকাশিত হয়েছে। আমার নামেও ঐ সংখ্যাটির আর একটি কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানালেন। রিগার রাইটার্স ইউনিয়ন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় আমাদের ছয় জনের সকলকেই কিছু কিছু বলতে হয়েছিল। ইংরেজি অনুবাদ সহ আমার একটি কবিতাও সেখানে পড়তে হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের অপর দুই কবির সঙ্গে। সেই কবিতা কয়টিই বোধ হয় ছাপা হয়ে থাকবে ঐ সংখ্যায়, আমার এই অনুমানের কথা জানাতেই তিনি বললেন, ঠিক তাই। তাঁর সেদিনের এই কথাটুকু কি গভীর প্রীতির পরিচায়ক নয়?

আরো বলি, ১৯৬৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসবের মূল কলকাতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুকে রাজী করানোর ভার পড়েছিল আমার ওপর। সেই সঙ্গে আরো একটি গুরুদায়িত্বও ছিল আমার। অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসবের সেই মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন তখনকার রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। কিন্তু তখন কলকাতার টালমাটাল অবস্থা। প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কিছুকাল রাষ্ট্রপতি শাসন চালু রাখার পর রাজ্যপাল ধরমবীর যে ভাবে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে এন ডি এফ মন্ত্রিসভার পত্তন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল যার ফলে তিনমাসের বেশি

সেই মন্ত্রিসভা স্থায়ী হতে পারেনি। সেই সময়ের মধ্যেই 'পত্রিকা'র উৎসব অনুষ্ঠানের দিন ধার্য ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ একরোখা মানুষ। ঐ হট্টগোলের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কলকাতায় আগমন বন্ধ করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। বেশ বেগ পেতে হলেও উভয় ক্ষেত্রেই আমি সফল হয়েছিলাম। স্নেহবশতই আমার অনুরোধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে এবং মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সে সময়ের তীব্র উত্তেজনার মুখেও রাষ্ট্রপতির আগমনে বাধা আরোপ না করতে সম্মত হয়েছিলেন। যুগান্তর-এর রজত-জয়ন্তী উৎসবে (১৯৬২) পৌরোহিত্য করার আমন্ত্রণও সুনীতিকুমার গ্রহণ করেছিলেন আমার অনুরোধে।

কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার যে কতটা কঠোর হতে পারতেন সে সম্পর্কেও আমার কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার এক বন্ধু-পুত্র ন-দশ বছর আগে মস্কোর মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ফ্রেণ্ডশিপ ইউনিভার্সিটি) ভর্তি হবার জন্যে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুপারিশ-পত্র সংগ্রহ করে দেবার জন্যে আমায় ধরেছিল। আমার বন্ধুও তাঁর ছেলের এই কাজটি করে দেবার জন্যে আমায় বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন। আমি ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করে সমস্ত বিষয় জানিয়ে যেই বললাম যে আমার বন্ধু-পুত্রটি আমার একখানি চিঠি নিয়ে প্রার্থিত সুপারিস-পত্রটি আনতে যাচ্ছে, অমনি তিনি জানালেন আমি যেন ছেলেটিকে তাঁর কাছে না পাঠাই, তিনি কিছুতেই ঐ রকম পত্র লিখে দেবেন না। দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে তিনি আমায় কড়া কথাই শোনালেন। বললেন, যদি সত্যি সত্যি আপনার বন্ধুর ছেলে হয়ে থাকে এবং একটি ভালো ছেলে, তা'হলে কি করে আপনি তার ক্ষতি করতে উদ্যোগী হলেন? কোন বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ হয়ে আসবে? আমি ছেলেটির ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই বলছি, ওকে মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালে আপনার বন্ধু ভুল করবেন।

এই হলেন সুনীতিকুমার। তাঁর কথাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। অন্য সূত্র ধরে মস্কোয় গিয়ে আমার সেই বন্ধু-পুত্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু কিছুকাল পরে তাকে ফিরে আসতে হলো অনেক ঝঞ্ঝাট ও ক্ষতি স্বীকার করে। সুনীতিবাবুর কঠোরতার আরেকটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলি। বৎসরাধিক কাল আগে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুট ভস্মীভূত হয়ে গেলে ইন্সটিট্যুটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য সুনীতিবাবুর একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে যুগান্তর সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে ঘটনার পরদিন সকালেই তাঁর কাছে একজন রিপোর্টার পাঠাতে চেয়েছিলাম যাতে ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে তাঁর মতামত, নতুন করে ইন্সটিট্যুট ভবন ও সংস্থাটি গড়ে তোলা ও কর্মসূচী নির্ধারণে তাঁর অভিমত এবং বিধ্বস্ত বাড়ীটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকদের কাছে পরিবেষণ করা যায়। কিন্তু ফোনে বার বার সবিনয় অনুরোধ জানিয়েও তাঁর সম্মতি আমি আদায় করতে পারিনি সে বিষয়ে। তিনি স্পষ্ট করেই আমায় সেদিন জানিয়ে দিয়েছিলেন রীতিমত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ স্বরে যে তিনি সহজে আর কখনো সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলবেন না কারণ তাঁদের লেখালোখির ফলেই (রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য নিয়ে) প্রতিদিন বহু পত্রাঘাত তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে এবং কেউ কেউ এমন কি তাঁর মৃত্যু কামনা করেও চিঠি লিখছেন। আমি যতই বলি, যুগান্তরের কোনো লেখাই এজন্যে দায়ী নয়, তিনি সে সব কিছুই শুনবেন না—তাঁর এক কথা, সব কাগজই সমান। কাগজের কোনো লোকের কাছেই তিনি আর সহজে কোনো বক্তব্য রাখতে রাজী নন।

এমনি কত ঘটনাই না সেদিন (২৯ মে, ১৯৭৭) মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল যেই আকাশবাণীর ঘোষণায় হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে জানতে পেলাম যে আমাদের এক মহাগুরু বিয়োগ ঘটেছে। বয়েস তাঁর হয়েছিল ঠিকই। সাতাশি বছর। তা'হলেও ঐ

বয়েসেও তাঁর কর্মক্ষমতা ছিল অক্ষুণ্ণ। কোনো অসুখ-বিসুখের কথা শোনা যায়নি। বিশেষ করে সে কারণেই সুনীতিকুমারের আকস্মিক পরলোক গমনের সংবাদে মানুষকে বিশেষ করে তাঁর অনুরাগীদের খুব বেশি বিহ্বল হতে হয়েছিল। আমার অতিরিক্ত বেদনাবোধ হয়েছিল অন্য কারণে। যাঁর কাছে যখন-তখন বিনা নোটিশেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছি ও বিরক্ত করেছি তাঁর চিরবিদায়ে তাঁকে গিয়ে একবার শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতে পারলাম না, সে আফশোষ আমাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলেছিল। আমার কোনো কোনো অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলেও কোনোদিন ভাষাচার্যের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। বরং কোনোরূপ ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি যে যখন যা ঠিক মনে করতেন তাই সরাসরি বলে দিতেন সেটাতো একদিক থেকে আরো প্রশংসার কথা।

তা'হলেও আগাগোড়া তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও সুনীতিবাবুর সমস্ত বক্তব্যই যে সমর্থনীয় তা বলা চলে না। রামায়ণ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা জনসমর্থন লাভ করেনি। কিছুকাল ধরে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ব্যক্তি স্বার্থে যে ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, তাতে অনেকেই দুঃখ পেয়েছেন এবং আমি নিজে তাঁর একান্ত সচিব শ্রীঅনিল কাঞ্জিলালকে অনেকদিন আগেই সেকথা জানিয়েছিলাম।

সে যাই হোক, সত্য কথা সোজাসুজি বলতে তিনি কোনও পরোয়া করতেন না। সে জন্য সুনীতিকুমারকে আমার বেশি ভালো লাগতো। তারই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে এ আলোচনা শেষ করছি। ১৯৬৪-৬৫ সালের ভাষা আন্দোলন দক্ষিণ ভারতে যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে চলেছিল এবং সে সময়ের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী ইন্দিরাজী যখন মধ্যপন্থা অনুসন্ধানের কথা বলছিলেন সেই পটভূমিকায়, আমি যুগান্তরে পঞ্চশীলের দেশ ভারতে পঞ্চরাষ্ট্র ভাষা (উত্তর ভারতের হিন্দি ও বাংলা, দক্ষিণ

ভারতের তামিল ও তেলেগু এবং ইংরেজি ) প্রবর্তনের এক আন্দোলন শুরু করেছিলাম যা সারাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ৬৫ সালে অক্টোবর বিপ্লব দিবসে কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাসে জনাকীর্ণ উৎসব-সন্ধ্যায় আমাকে দেখেই সরকারী-বেসরকারী বহু লোকের মধ্যেই সুনীতিকুমার বলেছিলেন—আপনি মশাই নানা যুক্তি দেখিয়ে বলছেন এত বড় দেশে একটি মাত্র সরকারী ভাষা জোর করে চালু করতে গেলে জাতীয় সংহতি বলে কিছু থাকবে না, কাজেই পঞ্চশীলের দেশে পঞ্চরাষ্ট্রভাষা প্রবর্তন করে দেশকে বিপদ থেকে রক্ষা করা হোক। কিন্তু মশাই, ওরা কি দেশের স্বার্থের কথা ভাববে না কোনো যুক্তির কথা শুনবে? যেন তেন প্রকারেণ হিন্দীকে ওদের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তথা গোটা ভারতের সরকারী ভাষা করতেই হবে, তাতে জাতীয় সংহতি গোল্লায় গেলেই বা কি আসে যায়। ভাষা কমিশনের সুপারিশের প্রতিবাদে আমি এক জায়গায় বলেছিলাম, 'ভারতভূমি থেকে ইংরেজিকে অপসারণের ইচ্ছার কারণ একটি মিথ্যাশ্রয়ী জাতীয়তা বোধের গর্ব, যা প্রায় হীনমন্যতার সামিল। ভারত একটি বহুভাষী দেশ, যেখানে কোনো-একটি ভাষা সর্বসাধারণের ইচ্ছাপ্রসূত বশ্যতা লাভ করতে পারে না।'

ভীড়ের মধ্যে কাউকে পরোয়া না করে হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে যিনি ষাটদশকে এমন স্পষ্ট কথা বলতে পারেন তাঁকে নিশ্চয়ই উপরাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি করার কথা ভাবা যায় না।

—দক্ষিণারঞ্জন বসু

সুনীতিকুমার যখন বেশ প্রবীণ—তখন তাঁর কাছাকাছি যাবার সৌভাগ্য আমার হয়।

আগে ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকতাম—অমন জ্ঞান—বৃদ্ধ ভাষাচার্য তাঁর সঙ্গে আমি কি কথা কইব? কিন্তু আলাপ হবার পর দেখলাম. তিনি অতি সরল মানুষ—সহজ পথের পথিক। তাঁকে ভয় করবার কিছু নেই।

অতি সহজেই নিতান্ত সাধারণ মানুষকেও তিনি কাছে টেনে নিতে পারেন।

বিদ্যা যে বিনয় দান করে এ কথা সুনীতিকুমারের সান্নিধ্যে এসে জানতে পারলাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনে আছে—

"নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুশি—
যে পথ দিয়া চলিয়া যাবো সবারে যাবো তুষি।"

সুনীতিকুমারই এই সহজ পথের পথিক।

তাঁর জ্ঞানের সাগর পরিমাপ করতে যাবো সে সাধ্য আমার কোথায়? তবে মানুষ সুনীতিকুমারকে যেমনটি দেখেছি—সেই সহজ পথের পথিক সম্পর্কে দু'চার কথা বলবার চেষ্টা করবো।

সুনীতিকুমার তাঁর সহজ আলাপনে অতি সাধারণ মানুষকেও স্বল্প কালের মধ্যেই আপনার করে নিতে পারতেন।

হেন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি আলাপচারী হতে না পারতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে—
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে॥"

সুনীতিকুমার এই সহজ কথা এত সুন্দর ভাবে অতি সহজে বলতে পারতেন যে, শুনে বিস্ময়ের সীমা থাকত না।

আমাদের বাঙালী-জীবন থেকে বৈঠকী মানুষ ফুরিয়ে যাচ্ছেন।

শরৎচন্দ্রকে দেখেছি—বৈঠকী গল্পে সবাইকে একেবারে মাতিয়ে রাখতেন।

সুনীতিকুমারও যখন গল্প সুরু করতেন—সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনত। হেন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি গল্প বলতে না পারতেন। তাঁর ভাণ্ডার ছিল—অজস্র আর অফুরন্ত।

কত দেশের কত কাহিনী যে তাঁর মগজে সঞ্চিত ছিল—ভাবলে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

সুনীতিকুমার প্রায়ই গল্পচ্ছলে আমাদের বলতেন—"আমার জীবনে কোনো ক্ষোভ নেই। সারা জীবন পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করবার সুযোগ পেয়েছি। বহু দেশের রান্না চেখে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে এসেছি, তাঁর স্নেহ লাভে ধন্য হয়েছি,—আর কি চাই?"

তিনি কৌতুক করে অনেক সময় আর একটি কথা বলতেন। তিনি তাঁর স্বভাব সিদ্ধ রসিকতায় আমাদের জানাতেন, ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে হয়ত সবাই ভুলে যাবো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "শেষের কবিতায়" যে বলেছেন, তাঁর উপন্যাসের নায়ক অমিট রে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব পড়ত—এতেই ত' আমি বিশ্বকবির দৌলতে অমর হয়ে রইলাম। পাঠক চিরকাল শেষের কবিতা পড়বে,—আর খোঁজ নেবে কে—এই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার!

তাঁর মুখের সেই অনাবিল হাসিটি যেন দেখতে পাচ্ছি। সুনীতিকুমারের সঙ্গে একবার যিনি মিশেছেন—, তিনি তাঁর সেই অনাড়ম্বর বাচন-ভঙ্গী কিছুতেই ভুলতে পারবেন না। সুনীতিকুমারের শেষ জীবনে অনেক সভা-সমিতিতে একসঙ্গে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সারা পথ বিচিত্র সব বিষয়ে তিনি এত মজাদার গল্প করতে করতে যেতেন যে শুনে শুনে আর আশ্ মিটত না।

যিনি জ্ঞানে আর কর্মে এত টইটম্বুর—তিনি যে এত রসিক মানুষ হতে পারেন—সে কথা ভেবে বিস্ময়ের সীমা থাকত না।

তিনি সবাইকেই 'আপনি' করে সম্বোধন করতেন। বারণ করলে কিছুতেই শুনতেন না।

কোনো সভা-সমিতি থেকে ফেরবার পথে—সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে কেউ যদি হাত ধরে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেত—তিনি বিরক্তিতে হাত সরিয়ে দিতেন। অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে-ফিরতেই তিনি ভালো বাসতেন। সব সময় মালকোচা দিয়ে ধুতি পরে পথে বেরুতেন। ঢিলে-ঢালা ভাব তাঁর চলা বলায় মধ্যে এতটুকু ছিল না।

অনেক নেমন্তন্ন বাড়ীতে পাশাপাশি বসে নেমন্তন্ন খাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রবীণ বয়েসেও তিনি বেশ খেতে পারতেন। যে পদটা ভাল লাগতো, আবার চেয়ে নিতেন। আবার নিজেই বলতেন, হজম করতে পারি যখন, তখন খাবোনা কেন? বিয়ে বাড়ীর প্রীতিভোজেও তিনি বেশ আস্বাদন করে খেতেন।

সুনীতিকুমার গান শুনতেও বেশ ভালো বাসতেন। বিশেষ করে প্রাচীন বাংলা গান তিনি খুব খুশী মনে শুনতেন। এই জাতীয় গানের আসরেও একসঙ্গে বৈঠকী-গান শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

সুনীতিকুমার নাটক দেখেও আনন্দ পেতেন। এতবড় জ্ঞানবৃদ্ধ ভাষাচার্য—কিন্তু যখন নাটক উপভোগ করতেন,—তখন সাধারণ দর্শকের মতো সকলের সঙ্গে মিলিত ভাবে আনন্দ করে সেই নাটকের রস গ্রহণ করতেন।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে, সুনীতিকুমার তাঁর প্রথম যৌবনে নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যখন কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে

অভিনয় সুরু করেন, তখন সুনীতিকুমার কোন্ যুগের নাটক অভিনীত হচ্ছে—সেটার বিষয় বিশ্লেষণ করে—রীতিমত পুঁথি-পত্তর ঘেঁটে আবিষ্কার করতেন—সে সময়ের পরিচ্ছদ কি রকম হবে। তাই ড্রইং করে এঁকে দেখিয়ে দিতেন। এই ভাবে গতানুগতিক যাত্রা-ঢঙের ভেলভেটের পোষাক তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন।

সুনীতিকুমার নিজে ছবি আঁকতে পারতেন। একথাও অনেকে জানেন না।

শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটক যখন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়—সুনীতিকুমার তখন অজন্তার অনুসরণে পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে নাট্য জগতের মজ্‌লিশেও তাঁকে হামেসা দেখা যেত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা আছে—

"আমায় রসে-বশে রাখিস মা—

আমায় শুক্‌নো সন্ন্যাসী করিস নে—"

সুনীতিকুমারের সান্নিধ্যে এসে দেখেছি—তিনিও সকল রসের আস্বাদন করতে ভালো বাসতেন। শুধু নিজের অগাধ-পাণ্ডিত্য নিয়ে বেঁচে থাকৃতে চাইতেন না।

সবাইকার সঙ্গে মিলেমিশে সহজ পথে তিনি চলতে চাইতেন, আর সকল রস আস্বাদন করে মনের তৃপ্তি বিধান করতে তিনি সর্বদাই উৎসুক ছিলেন। তরুণ সাহিত্যিকরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তিনি অনেক সময় কৌতুক করে বলতেন, হ্যাঁ, আপনার বই ত' নিশ্চয়ই পড়ব। কিন্তু একটা কথা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, আমায় ভূমিকা লিখতে হবে না ত?

শেষ বয়েসে তাঁর মনে একটা ভূমিকা রচনার ভীতি এসে গিয়েছিল।

জীবনে কত বইয়ের যে ভূমিকা লিখেছেন, তাঁর হিসেব

ত' নেই। সে কথা নিয়েও অনেক সময় রসিকতা করতে ছাড়তেন না।

ছোটদের কাছেও নানা রঙের গল্প বলতে তিনি ভালোবাসতেন। বিশেষ করে তাঁর ছেলেবেলার মজাদার গল্প।

কয়েকবছর আগে কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। তিনি কবির গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ বচনে কবিকে এবং উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলেন।

সুনীতিকুমারকে আমি সর্বশেষ দেখি সাউ বাড়ীর প্রাচীন বাংলা গানের আসরে।

সেখানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন বাংলা গান শুনেছিলেন। তারপর আমরা একই সঙ্গে একই টেবিলে এক প্রীতিভোজে যোগদান করেছিলাম। সেই মধুর-স্মৃতি আজও মনে জাগ্রত আছে।

জ্ঞানবৃদ্ধ ভাষাচার্য ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই সামান্য স্মৃতি-চারণ শেষ করলাম।

—স্বপনবুড়ো

# ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের জন্ম কুণ্ডলী

( ভৃগুজাতক )

জন্ম ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৬/৫ মিঃ ; জন্মস্থান : কলিকাতা। ২৬শে নভেম্বর ১৮৯০ খ্রীঃ, বুধবার। তিরোধান : ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৩৮৪।৪।২০ মিঃ-১৯৭৭ খ্রীঃ ২৯শে মে। বৃষলগ্ন, রোহিণী নক্ষত্র, বৃষরাশি, নরগণ- শূদ্রবর্ণ।